সঞ্জয় ভট্টাচার্যের
শ্রেষ্ঠ কবিতা

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের

শ্রেষ্ঠ কবিতা

সুশান্ত বসু
-সম্পাদিত

ভারবি
১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৪০৮, সেপ্টেম্বর ২০০১

অঙ্কন : রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক : গোপীমোহন সিংহরায়। ভারবি। ১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট।
কলকাতা-৭৩। অক্ষরবিন্যাস : ভারবি। মুদ্রক · শ্যামলী ঘোষ।
কল্যাণী প্রিন্টার্স। ১৭ কানাই ধর লেন। কলকাতা-১২


Ranjan'01

কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য শুধুই কি কবি? গ্রন্থাকারে ছাপা এবং নানা পত্র-পত্রিকায় ছাপা অথচ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত নয় এ-রকম সাঁয়ত্রিশটি উপন্যাস, তিনটি গল্প-গ্রন্থ, দশটি প্রবন্ধ-গ্রন্থ, একটি কিশোরপাঠ্য-কাহিনী, তিনটি নাটক এবং পূর্বাশা এবং অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর ইতিহাস, ধর্ম, পুরাণ এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি-বিষয়ক অসংখ্য অগ্রন্থিত প্রবন্ধ—এ সবকিছুর মনস্বী স্রষ্টার কথা আজ ক-জন পাঠকই বা জানেন তেমন করে। মৃত্যুর তিন দশক পরেই সঞ্জয় ভট্টাচার্য হয়তো-বা লোকস্মৃতির আড়ালে হারিয়ে যাওয়া এক লেখক। যে-জীবনানন্দকে তিনি জেনেছিলেন আধুনিক বাঙলা কবিতার মন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে, মৃত্যুর আগেই তিনি তাঁর ইতস্তত-বিকীর্ণ জীবনানন্দ ভাবনাগুলি ভারবি থেকেই প্রকাশের আয়োজন করেন 'কবি জীবনানন্দ দাশ' নামে। সম্ভবত এটি এবং কিছুকাল আগে প্রকাশিত তাঁর 'উর্বর উর্বশী' কাব্যগ্রন্থের একটি ভাষ্য-সম্বলিত সংস্করণই, হয়তো এখনও পর্যন্ত তাঁর প্রাপ্তব্য গ্রন্থ। কবির তিরোধানের পরেই 'ভারবি'-র শ্রেষ্ঠ 'কবিতা গ্রন্থমালা'র অন্যতম বই হিসেবে প্রকাশিত হয় 'সঞ্জয় ভট্টাচার্যের শ্রেষ্ঠ কবিতা'। আবার নতুন করে, আরও অনেক বেশি প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত কবিতা সংযোজিত করে তারই দ্বিতীয় সংস্করণ এই গ্রন্থ।

২

এখনও পর্যন্ত সঞ্জয় ভট্টাচার্যের যে-দুটি পরিচয় তাঁর আর সব পরিচয়কে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে, সে-দুটি হল বাঙলা সাহিত্যের নব্যমননের দিশারী 'পূর্বাশা' পত্রিকার ব্রতনিষ্ঠ সম্পাদক এবং আধুনিক বাঙলা কবিতার এক স্বভাব-স্বতন্ত্র কবি। ১৯৩২-সালে তখনকার ত্রিপুরা জেলার কুমিল্লা শহরের এক চায়ের দোকানে যখন 'পূর্বাশা' প্রকাশের সংকল্প বাস্তবায়িত হল, তখন কল্লোল, কালিকলম এবং প্রগতি পত্রিকা অবলুপ্ত। অক্লান্ত পরিশ্রমে আর প্রযত্নে স্বদেশ ও বিশ্বচেতনায় তাকে একটি শক্ত মননের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সঞ্জয়বাবু। একদিকে সৃজনশীল সাহিত্য—অন্যদিকে ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, সাহিত্য, শিল্প, সংগীত, রাজনীতি, ধর্ম, দর্শন—এমনি সব নানা বিষয়ে বহুস্রোতা ছিল পূর্বাশা। কত মান-অপমানের ঝড়-ঝাপটা সহ্য করে আমৃত্যু তাকে লালন করেছিলেন তিনি। সঞ্জয়বাবুর মৃত্যু পর্যন্ত এবং তার পরেও কিছুকাল চলেছিল পূর্বাশা, তাঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধু সত্যপ্রসন্ন দত্তের একান্ত প্রযত্নে।

৩

তবুও সব-কিছুকে ছাপিয়ে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কবি-পরিচয়টিই হয়তো-বা অনেক উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আজও। 'পূর্বাশা' পত্রিকাটিকে সম্বল করে কলকাতায় এসে সঞ্জয় ভট্টাচার্য বাসা বেঁধেছিলেন আমৃত্যু অকৃতদার অভিন্নহৃদয় বন্ধু সত্যপ্রসন্ন দত্তের সঙ্গে।

১৯৩৫-এ কলকাতা থেকে বেরোল তাঁর কুড়িটি কবিতার একটি সংকলন 'সাগর ও অন্যান্য কবিতা'। যে ১৯৩২-এ কলকাতায় পা রাখলেন কবি, সেই বছরেই প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের 'পরিশেষ' এবং 'পুনশ্চ'— আর ১৯৩৫-এ 'শেষসপ্তক' ও 'বীথিকা'। পাশাপাশি ১৯২৭-এ প্রকাশিত হয় জীবনানন্দের 'ঝরাপালক'; ১৯৩০-এ সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'তন্বী' ও বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর বন্দনা', অজিত দত্তের 'কুসুমের মাস', অচিন্ত্যকুমারের 'অমাবস্যা'; ১৯৩২-এ বুদ্ধদেব বসুর 'একটি কথা' ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'প্রথমা'; ১৯৩৩-এ বুদ্ধদেব বসুর 'পৃথিবীর পথে' ও বিষ্ণু দে-র 'উর্বশী ও আর্টেমিস'—এমনি সব কাব্যগ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথকে প্রাণপাত ও পরিপ্রশ্ন করে এইসব কবিদের উজানযাত্রার পথে হাঁটলেন না সঞ্জয় ভট্টাচার্য। গীতিকবিতার এক স্বতন্ত্র সড়ক ধরে তিনি শুরু করলেন তাঁর চলা। 'পূর্বাশা'র এক বছর আগে প্রকাশিত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকা 'সাগর'-এর সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে স্বাগত জানিয়েছিল 'স্বপ্নের কবি' বলে। আরও লিখেছিল, 'বিপর্যস্ত আধুনিক কাব্যের আবহাওয়ায় এ কাব্যের বিশেষত্ব আছে। যে সমস্ত স্বপ্ন, যে সমস্ত অনুভূতি অত্যন্ত সন্তর্পণে আলতো পায়ে আমাদের কল্পনার মাটি মাড়িয়ে চলে, লেখক তাদের ধরে রাখতে চেয়েছেন তাঁর সোনালি ভাষার ইন্দ্রজালে।' বাস্তবিকই 'সিকতালগ্ন যে সাগর রূপায়িত হয় শর্বরীর কালো স্রোতে', 'মানুষের আত্মার গহনতায়'—তা কোনও উচ্চকিত বিধূনন নয়, কবি তাঁর নিভৃত মর্মলোকে শুনেছেন সেই সমুদ্রস্বর—কবির ভাষায় তা যেন স্বপ্নিল কলনাদ। কবির উত্তরভাবনায় বারবার নানা রূপে, নানা বিভঙ্গে, নানা জটিল বিস্তারে ফিরে আসবে তাঁর এই প্রথম যৌবনের সাগর আর সাগরবেলার জলকন্যারা—তাঁর প্রথম জীবনের কল্পপ্রতিমা উর্বশী, সাবিত্রী আর মেঘকুমারীরা। আপাতত আমরা শুনি গভীর রাত্রে বালুবেলাবাসিনী জলকন্যাদের মুক্তার মতো সাদা হাসি, সাগরের অবিরাম করতালিধ্বনি, নীল হাওয়ার শব্দ, কালো হিম ঘুমের স্তব্ধতা, গাছের সবুজ আয়না, পদ্মমধুর মতো ভোরের লাল চাঁদ, সাবিত্রীর বুকে জমে থাকা জ্যোৎস্নার মেঘ এবং তার চোখে গলে-পড়া রাতের নীল ছায়ার অন্য-এক অভিজ্ঞতার জগতটিকে। এই বই-এর কবিতাগুলি পড়ে ওই ১৯৩৫-এই সুধীন্দ্রনাথ কবিকে জানিয়েছিলেন, 'আধুনিক বাঙালি গীতিকবিদের মধ্যে প্রকৃত গীতিকবিতা লেখেন কেবল আপনি।' খুব সংগতভাবেই সঞ্জয় ভট্টাচার্যেরই কথার সূত্র ধরে প্রশ্ন তুলেছেন তাঁর এক সমালোচক : কথাটা কি প্রকৃত, নাকি হওয়া উচিত ছিল প্রতীকী। বাস্তবিকই এই কাব্যগ্রন্থের আপাত-সহজ উচ্চারণের ভিতরমহলে লুকিয়ে থাকে অবচেতনের গভীর থেকে উঠে আসা প্রতীক-ছবির আলাদা এক জগৎ? রসেটি, সুইনবার্ন, উইলিয়ম মরিস প্রমুখ প্রি-র‍্যাফেলাইট কবিগোষ্ঠীর যে কবিরা কল্পপ্রতীকের বর্ণময় স্বপ্নছবি এঁকেছেন তাঁদের কবিতায়, তাঁদের মধ্যে তখন কবির একান্ত প্রিয় কবি ছিলেন উইলিয়ম মরিস। সেই প্রি-র‍্যাফেলাইট কবির মতো দূরযানী মগ্নচৈতন্যের কল্পছবি ফুটে উঠেছে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের এই প্রথম কাব্যগ্রন্থেও। প্রাচী এবং প্রতীচীর যে পুরাকল্পকথার নায়ক-নায়িকারা অবিরলভাবে নানা তির্যক অনুষঙ্গে আর অনুভাবনায় বারবার ফিরে আসবে তাঁর উত্তরকাব্যে সেই দুষ্মন্ত-শকুন্তলা, উমা, উর্মিলা, উর্বশী, সাতভাই-চম্পা আর পারুল-

বোন, ডিডো, হেলেন অ্যাডোনিস, সাইকি, কিউপিড আর ইউসুফ-জুলেখার নানা স্মৃতিসূত্রের উচ্চারণও শুনতে পাওয়া যাবে এই কাব্যে। তাঁর এই কাব্যের 'জ্যোৎস্নায়' নামক কবিতাটির কথা এই প্রসঙ্গে বিশেষ স্মরণীয়।

৪

আবছা ধূসর আলাদা এক প্রতীকের জগতে এমনি করে শুরু হল তাঁর কবি-চৈতন্যের আলাদা চলার এক পথ। তবুও যে আকাশে উড়ছে এরোপ্লেন, আর পুরনো চাঁদের অমলিন জ্যোৎস্না—আর রজনীগন্ধার সুবাসের বিপ্রতীপে যেখানে ঘরের ভিতরে জ্বলে নতুন দানব ইলেকট্রিসিটি, সেই শাহরিক অভিজ্ঞতার ভিতরে-ভিতরে ঘনিয়ে ওঠে আর-এক নতুন মাত্রা। দুই বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি এক নিরবলম্ব ভাঙনের মাঝখানে বাস এই কবির 'মুমূর্ষু' পৃথিবীতে। স্বপ্নের জগতে ঘা-লাগা কবির পঁচিশটি কবিতার দ্বিতীয় সংকলন 'পৃথিবী' বেরলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার বছরেই, ১৯৩৯-এ। তাঁর মনে হল: 'আমরা পাইনি এসে পৃথিবীর প্রথম যৌবন;/আকাশে হরিয়ে গেছে কতো কথা তরুণ তারার—/কতো নীল অন্ধকার, ম্লান কতো সূর্যের স্বপন—/জ্যোৎস্নায় জাগর রাত, রাতেরও তা মনে নেই আর।' মনে হল : 'আমরা পেয়েছি শুধু পৃথিবীর অন্তিম দিবস,/নামে মৃত্যু পৃথিবীর জরাজীর্ণ ভগ্ন-দেহময়;/আমাদের পঙ্গু আত্মা পায় নিত্য মৃত্যুর পরশ,/মানুষের ইতিহাস বুঝি আর হবে না অক্ষয়।' ভাঙা বন্দরে ভিড় জমানো ভাঙা পৃথিবীর স্মৃতি বুকে নিয়ে যে দুঃসাহসিক জনতা সন্ধান করে দিগন্তপারের এক নতুন সমুদ্রতীর, সেই সমুদ্রপারের জন্য কবিকণ্ঠে ঘনিয়ে ওঠে এক নতুন আর্তি। আজ 'যে-আকাশে রঙ নেই, ওড়ে শুধু কালো এরোপ্লেন—/বিষের ধোঁয়ায় যার ছায়া আজ মৃত্যুর মতন—/যেখানে হয়েছে মেঘ আগুনের শিখার শরীর—/আমাদের রক্তে নেই ব্যথা, ভয় নেই পৃথিবীর।' স্বপ্নজীব এক নিজস্ব নির্জনের বাসিন্দা এই সময়-চেতন কবির তাই মনে হয়: 'কোথায় জ্বলেনি বাতি ভয়ের ছায়ার অন্ধকার—/মাটির সোনালি শস্য ভস্ম হয়ে ওড়ে অহর্নিশ—/ সহস্র মায়ের চোখ সন্তানের মৃত্যু-স্বপ্নময়—/কোথায় মানুষে আর মানুষের নেই পরিচয়।'

উত্তরঙ্গ এই সময়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কবির মনে হয় : 'আর ফুলের গন্ধ নয় পৃথিবী,/ভালো লাগে এবার ঘামের গন্ধ—'। পৃথিবীকে পীড়ন করে মানুষের দেহের যে 'পুলকাশ্রু'—যে রুপালি জল আবহমান ফুলের গন্ধবহ এই পৃথিবীর 'জলের চেয়ে ঠান্ডা, আকাশ/ঠান্ডা সুন্দর আর পবিত্র।' আজ তাঁর মনে হয় : 'জন-সমুদ্রের নোনা জল/প্রচুর তার দুরন্ততা', সাগরের 'উত্তাল লোনা ঢেউয়ের চেয়ে।' 'পৃথিবী'-র কবির চোখে যে নতুন শহরের স্বপ্ন, 'শোষণের নিশান তার নেই/ভিক্ষুকের অক্ষম দেহে/গণিকার নিষ্প্রভ চোখে/নেই জীবনের অবিরাম মৃত্যুস্তুতি/মানুষের অজস্র প্রয়োজন সেখানে অজস্র আয়োজনে সমাপ্ত।' সময়ের অভিঘাতে লেখা এইসব সরল, বিবৃতিময় আকাঙ্ক্ষার স্বরগ্রামের চার বছর পরে ১৯৪৩-এ বেরোয় তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'সংকলিতা'। 'সাগর' এবং 'পৃথিবী'র পঁয়তাল্লিশটি কবিতার ষোলটি বর্জন করে এবং তার সঙ্গে আরও উনত্রিশটি

কবিতা জুড়ে তৈরি তাঁর এই নতুন কাব্য-সংকলন। স্বপ্ন আর বাস্তবের জোড়ে-গাঁথা এই কাব্যগ্রন্থে যে সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে আমরা পাই তার একদিকে শুনি এই ক্ষুব্ধ উচ্চারণ : 'এ বসন্ত, এই আলো, পুরনো দিনেরা/ধানের বাতাস আর ঘুম দিয়ে ঘেরা/জাগে আজ মৃত্যুর ছায়ায়,/আকাশ কান্নায় ফেটে যায়/বিমানের পাল্লার ইস্পাতে—/পৃথিবীকে চূর্ণ করে উড়ায় হাওয়াতে/লরির সারির সরীসৃপ—/সবুজ সমুদ্র ভরে জেগে ওঠে সৈন্যের ধূসর মেটে দ্বীপ।/তবু তাই ভালো:/এ ভূখণ্ড চেনে শুধু এক সূর্য আর তার আলো,/সে আলো এবার মুছে যাক।/সাদা বক উড়ে গেছে এখন উড়ুক কালো কাক।' যতই তিনি নানাভাবে খিন্ন মনস্তাপে বলুন না কেন : 'আমাদের জীবন থেকে/ছিনিয়ে নাও দেবতা,/তোমার সূর্যকে—। ... দাও আমাদের আকাশকে ইস্পাতে মুড়ে—/বিদ্যুতে জ্বলুক আমাদের সূর্য/কার্বন-ডায়োক্সাইডে ভরে থাক হাওয়া, ... ।তুমি মরে যাও দেবতা—/ভরে উঠুক আমাদের নতুন পৃথিবী/ তোমার প্রেতাত্মার দীর্ঘশ্বাসে।' তবুও তো এই পরম আস্তিক্যময় বিশ্বাসের উচ্চারণ শুনি তাঁর কণ্ঠে : 'পৃথিবীর স্বপ্ন আছে তার মৃত্যু নাই/ জীবনের পরমাণু বেঁচে থাকে তাই।' সংকলিতার অনেক কবিতাই হয়তো বা কবির তাৎক্ষণিক আবেগের স্বপ্ন আর স্বপ্নভঙ্গের বেদনাময় অভিজ্ঞান, তবুও কবির আত্মশিল্প-নির্মাণের ইতস্তত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ইন্দ্রিয়-সংবেদ্য বাক্‌প্রতিমা— যেমন, 'বাঙলার ছবি ধানের রোমশ দেহে জেগে ওঠে', 'মধ্যাহ্নসূর্যের পেশী'—ইত্যাদি আলাদা করে আমাদের মনকে ছুঁয়ে যায়। এই সংকলিতারই 'ঘুম' কবিতাটিতে কবি স্মরণ করেছেন মানবেতিহাসের কত হারানো দিনের কথা—তাকলামাকান মরুভূমি আর কার্থেপিয়ার বনভূমিচর মানুষদের কথা, গঙ্গা-সিন্ধু-নর্মদা-তীরলগ্ন প্রাচীন কৃষিসভ্যতার কথা, প্রাচীন সুমের আর চীনের কথা, আর্যদের কথা। 'সাগর'-এ যে পুরাপ্রতিমাদের আভাস পেয়েছি আমরা, কবিকল্পনায় তেমনি ভিড় করে আসে '[illegible]য়ার যে আকাশে পাহাড়েব পিঙ্গল-আস্বাদ' পামীরের সেই আকাশ,—এরই পাশাপাশি আসে ভারতীয় এবং বাঙলাদেশের ইতিহাস-ভূগোলের নানা প্রসঙ্গ। ১৭৪৭-এ প্রকাশিত তাঁর 'নতুন দিন' পুস্তিকার কবিতাগুলি কবির উজ্জীবিত বিশ্বাসের স্বরলিপির মূল্যেই চিহ্নিত। কবি স্বপ্ন দেখেন, যুদ্ধোত্তর নতুন পৃথিবীর শ্রমজীবী মানুষের নবজন্মের কথা : 'নবজন্মসম্ভবা এক 'পৃথিবীর নবজন্মদিনে/ রেখে যাই আমার বিস্ময়,/আমার চোখের আলো,/মনের খানিক পরিচয়।'

যে প্রত্নবীজ আর কাল-কালান্তর ও দেশ-দেশান্তর-প্রসৃত মানসযাত্রার আভাস-ইঙ্গিত আগে মিলেছিল, ১৯৪৮-এ প্রকাশিত এশিয়া, ভাবতবর্ষ এবং বাঙলা নামিত 'প্রাচীন-প্রাচী' গ্রন্থের তিনটি দীর্ঘ কবিতার বিসর্পিত আবেগে তার বিস্তারকে আমরা খুঁজে পাই। আটটি কবিতার সংকলন তাঁর আট পৃষ্ঠার পুস্তিকা 'যৌবনোত্তর'। তাতে বিবৃত এক বিপ্রলব্ধ হৃদয়ের বিনম্র উচ্চারণ। যে 'অনুভবগুলো' একদিন ছিল 'রক্তের সৈকতে/শরীরের অশরীরী গান' আজ তারা কবির কাছে এক বেদনাময় আনন্দের দুঃখ-সুখের উচ্চারণ। যৌবনোত্তরের পরে ১৯৫২-তে বেরোয় 'অপ্রেম ও প্রেম' কবিতাগুচ্ছ। 'সাগর'-এর লিরিক কবির পূর্ণতর পরিচয় নিবদ্ধ রয়েছে এই বইয়ের 'অপ্রেম ও প্রেম' শীর্ষক তেরোটি এবং শেষ তিনটি কবিতা বাদে সাতটি—এই মোট

কুড়িটি কবিতার মধ্যে। এই কবিতাগুলি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসু তাঁকে বলেছিলেন, বাঙলা লিরিকের অগ্রণী কারুশিল্পী চিত্ররূপময় প্রতীকী কণ্ঠস্বরের কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য।

এতদিন পর্যন্ত কবির ভাষাশিল্প ছিল সহজ ইন্দ্রিয়সংবেদী এক প্রকাশরীতি। কিন্তু একদিকে কবির কাল-কালান্তরবাহী পুরাণী প্রজ্ঞা ও ইতিহাসের অনুধ্যান তাঁর কবিতার ভাষায় নিয়ে এলো কারুকৃতির এক নতুন ভঙ্গি ও গড়নের এক আত্মবৃত জটিল বিন্যাস। অপ্রেম ও প্রেমের শেষ তিনটি কবিতা বিশেষ করে 'পারমিতিহাস' থেকে যার শুরু, ১৯৫৩-তে প্রকাশিত তাঁর 'পদাবলী' কাব্যগ্রন্থের তিরিশটি কবিতার মধ্যে ছন্দ ও শব্দের নানা কারুকাজে সংস্কৃত সাহিত্যলোক, তথা মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের উত্তরাধিকার থেকে প্রাপ্ত বাক্‌চাতুরিময় বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে একালেরও নায়িকাদের উদ্দেশ্যে যে পদাবলী তিনি রচনা করেছেন, সেখানে তৎসম শব্দবন্ধের অবগাঢ় উচ্চারণ-শৈলির পাশাপাশি যেমন কথ্য চালের এক লিরিক-শৈলির সহাবস্থান আমরা লক্ষ্য করি, তেমনি কবির এক অভেদ্য আত্মভাষাও পাঠকের পক্ষে এক প্রতিবন্ধের আড়াল তৈরি করে। হয়তো-বা আগামী দিনের আরও মনোযোগী দীক্ষিত পাঠক পদাবলীর এই কবির স্বনিকেত জগতে পৌঁছতে পারবেন। প্রাচীন-প্রাচীর তথ্যময় আবেগ আর 'পারমিতিহাসের' ইতিহাস-সন্ধানী কবি পদাবলীর নিরীক্ষা-পথ পেরিয়ে পৌঁছান ১৯৫৮-তে 'সবিতা' কিংবা ১৯৬৫-তে 'উর্বর-উর্বশী'তে। সেখানে কবির প্রাচ্য-প্রতীচ্য এবং গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি এবং ত্রিপুরার আঞ্চলিক ইতিহাসের বুনটে গাঁথা 'মানসীজা', 'সমুদ্রীয়া আপ' এবং 'ভাগীরথী' এই তিনটি শীর্ষকে, নিজস্ব এক সন্ধ্যাভাষার সঙ্গে মাঝে-মাঝে আশ্চর্য লিরিকের মিশেল ঘটিয়ে লিখেছিলেন চৌত্রিশ পাতার যে 'সবিতা'—তারই এক ভিন্নতর সম্প্রসারণ আমরা লক্ষ্য করি উর্বর উর্বশীতে। সেখানে গড়নের দিক থেকে কতখানি এলিয়টের 'ওয়েস্টল্যান্ডের' আদলে গড়তে চেয়েছেন তিনি সৃষ্টির জগৎটিকে এবং মহেনজোদারো সভ্যতার সঙ্গে বাঙলার আদি সভ্যতার যোগসূত্র আবিষ্কারে প্রাচীন গ্রীক ও মিশরীয় ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের বৈদিক এবং পৌরাণিক উত্তরাধিকারের এবং অন্যান্য সাহিত্যিক অনুষঙ্গকে তার বিচার এবং বিশ্লেষণের কাজ করেছেন মনস্বী কিছু গবেষক। সেইসব উদ্দীপক ভাবনা হয়তো-বা সঞ্জয় ভট্টাচার্যের এই আপাত-দুর্বোধ্য জটিল কাব্যকারুকৃতিটিকে নতুন করে আবিষ্কারে প্রণোদনা জোগাবে। তবে একটা কথা এখানে স্মরণীয় : 'সাগর' থেকে তাঁর পুরাভাবিত কল্পনার যে শুরু তারই পরিবাহিত উত্তরাধিকার আরও অনেক প্রজ্ঞাসিদ্ধ অভিজ্ঞতায় জারিত হয়ে শেষ-পর্যন্ত ভিন্নতর এক শিল্পরূপ পরিগ্রহ করেছে পরবর্তী তাঁর কাব্যশিল্পে।

সবিতার পাশাপাশি ১৯৫৮-তে বেরোয় তাঁর স্ব-নির্বাচিত কবিতা। পদাবলী-র আগে লেখা তাঁর নির্বাচিত কবিতার একটি সংকলন। এই বইয়ের ভূমিকায় কবি লিখেছিলেন, 'আমার কবিতার জন্মলক্ষণগুলোর দিকে তাকিয়ে আমি বলতে পারি যে, ওগুলো হচ্ছে আমার বিশেষ-সময়ের বিশেষ জ্ঞান। সময়টা কখনো এ-শতকের আবহাওয়া ছেড়ে চলে গেছে, কখনও-বা আবহাওয়া মনের উপর চেপে ধরেছে।

কাজেই জ্ঞানটা কখনও হয়েছে অনুভব, কখনও সুস্পষ্ট ভাবনা। অনুভবের এলাকায় স্পষ্ট চিন্তা কাজ করতে পারে বলে আমার মনে হয় না—কারণ মনের উপর সব ছাপ স্পষ্ট থাকে না। আর অনুভবের কাজই হচ্ছে, মনের সমস্ত ছাপকে উদ্ধার করে আনা। ছাপ হয়তো উদ্ধার হয়, কিন্তু অস্পষ্টতা কোনো-ছবিতেই দূর হয় না। জটিল বা অস্পষ্ট ছাপের অন্বেষণে গিয়ে কবি দুর্বোধ্য হয়ে পড়েন। কাজেই দুর্বোধ্যতা কবিতার শত্রু নয়, সহচর।' তাঁর গত পঁচিশ বছরের 'মানসিক অভিজ্ঞতার' এই চিত্রশালার সবগুলোই যে 'পরিচ্ছন্ন' নয় এ-কথা জানিয়ে তিনি লিখেছেন, 'কবিতার ক্ষেত্রে আমি নিজেকে পচ্ছিন্ন করতে পারিনি। নিজে পাঠকের ভূমিকা নিলেও আমি আমার কবিতা থেকে একটি সুস্পষ্ট কবি-আলেখ্য পাব না, কেন না কোনো বিশেষ অভিজ্ঞতা বা চেতনা এখানে বিকাশের পথ পায়নি। আমার খণ্ডিত সত্তার পরিচয়ে আমার কবিতাগুলো আমার নিকট পরিচিত। যে সত্তা সব ক্ষেত্রে কবিসত্তা কিনা সে সম্পর্কেও আমার সন্দেহ দুস্তর। আমি যদি আমার কবিতা পাঠকের উপযোগী করে বাছতে যাই তাহলে হয়তো বিশ-পঁচিশটির বেশি আমার মনোনীত হবে না।' কবির এরকম অকপট স্বীকারোক্তির পরও তো দেখি নিজেকে খোঁজার আরও অনেক বেশি স্মৃতি-অনুভবের টুকরো ধরা আছে তাঁর স্ব-নির্বাচিত সংকলনে।

'সবিতা' আর 'উর্বর-উর্বশী'র মাঝখানে ১৯৬৩-তে বেরোয় তাঁর 'উত্তরপঞ্চাশ'। জীবনের প্রায় শেষ কুড়ি বছরের সময় জুড়ে এক সর্বগ্রাসী বিষণ্ণতা, এবং স্নায়ু-বৈকল্যের ভারসাম্যহীনতার শিকার হয়েছিলেন কবি—তারই ধূসর স্মৃতিবহ অনুভবের নানা টুকরো ছড়িয়ে আছে 'উত্তরপঞ্চাশ'-এর কবিতাগুলির মধ্যে। এখানে 'রোদন-রতির স্মৃতি নিয়ে' কবি বলেন, 'রোগের রোদন শুনি আবহমানের পথে-পথে।' তবু এরই মধ্যে কোনও-এক মানুষী মনসিজার নম্র নর্মস্মৃতির সঙ্গে নিসর্গের নয়নাভিরাম দৃশ্যপুঞ্জের আবেশ ঘনিয়ে ওঠে তাঁর কবিতায়। 'বার্ধক্যের এই অবেলায়' জাতিস্মর নানা অনুভবের স্বপ্নময় উচ্চারণে লিরিকসিদ্ধ সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কবি-চৈতন্যের একটি নতুন মাত্রাকে এখানে পাই।

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের অন্তর্গূঢ়, রহস্যময় জটিল মনটিকে যাতে আরও একটু ব্যাপ্তিতে এবং গভীরতায় চেনা যায়, তারই জন্য এই সংস্করণে তাঁর অনুবাদ ও অনুস্মৃতির পাশাপাশি গ্রন্থ-বদ্ধ করেছি তাঁর আরও বেশ-কিছু অগ্রন্থিত কবিতা। আশা করি, মরমী ও মনস্বী পাঠক সেই আর্ত-অভিমানী কবিকে আরও গভীরভাবে জানার রসদ পাবেন এই গ্রন্থে।

১ সেপ্টেম্বর ২০০১ সুশান্ত বসু

সূচিপত্র

সাগর ও অন্যান্য কবিতা (প্রথম প্রকাশ ১৯৩৫)

পৃথিবী [প্রথম সংস্করণ ১৩৪৬ (১৯৩৯)]

সংকলিতা (প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৪২)

অনুসৃতি

সাগর

বালুর বেলায় জলকন্যারা নাকি
মুক্তার মতো সাদা হাসি হাসে গভীর রাতে,
ঢেউরা যখন কালো পাহাড়ের পাথর ঘিরে
ডানা ঝাপটায় খাঁচার পাখির মতো?

দূর সাগরের ঢেউয়ের ফেনার কোলে
জলকন্যারা চেয়ে থাকে নাকি আকাশ পানে,
মুঠো-মুঠো তারা বিছায়ে আকাশে আঁধার বুঝি
ছায়াপথ রচি গোপনে তাদের ডাকে!

পাপড়ির গালে শিশির পড়ার মতো
লঘুপদে যদি যাও কোনোদিন সাগর-তীরে,
ছায়ার মতন কাছে এসে ঘেঁষে দাঁড়াবে, দেখো,
ছায়াপুরী ছেড়ে জলকন্যারা সবে।

সজল নিটোল নীল আঁখি পানে চেয়ে
স্বপন আনিও নয়নে, কয়ো না একটি কথা,
কথা যদি কও দেখিবে কোথায় মিশেছে তারা,
সুমুখে সাগর করতালি দেয় শুধু।

ঘুম

কালো মেয়ে ভালোবাসে ঘুম,
আর ভালোবাসে কালো ছায়া ফেলে দূরে চেয়ে-থাকা।
রাত যদি ঘন হয়ে ওঠে,
হাওয়া হয় নীল,

আর যদি ঘুম ভেঙে যায়,
তোমার শিথিল গায়ে পাওনি কি কালো হিম-ছোঁয়া?
কালো মেয়ে ভালোবাসে রাত
আর ভালোবাসে দিতে চোখ ভরে কালো হিম-ঘুম।

যে দুপুরে ছায়া ফেলে আসে না মেঘেরা
তোমার সুমুখে এসে কালো মেয়ে ফেলেছে কি ছায়া?
লেগেছে তোমার বুকে
অলস নরম
ওর ভীরু বুক কেঁপে-ওঠা?
আর ঘুম নেমেছে কি চোখের পাতায়?

উর্বশী

তার নয়নের নিবিড় ছায়ায় আমার নয়ন যদি
গাহন করিতে নামে,
উর্বশী, তুমি কালো কুন্তলে ঢেকো না মুখ,
সুমুখে অনেক রাত।

নীল পাহাড়ের চূড়ায় এখনো ধূসর সন্ধ্যা শুধু
সাগরে ওঠেনি ঢেউ,
আকাশের তলে পথিকের চোখে স্বপনের আভা হয়ে
তারারা পড়েনি গলে—
উর্বশী, তুমি কালো কুন্তলে ঢেকো না মুখ,
সুমুখে অনেক রাত।

গভীর রাতের ছোট-ছোট হিম হাওয়ার ছোঁয়ার মতো
যদি সে নিশ্বাস ফেলে—
উর্বশী, তুমি কালো কুন্তলে ঢেকো না মুখ,
আসেনি গভীর রাত।

এখনো হয়তো ফুল হয়ে কুঁড়ি চমকে ওঠেনি কেঁপে
আপন গন্ধে ভুলে,
পাখির কণ্ঠে ঘুম জেগে উঠে এখনো তোমার চোখে
কয়নি ঘুমের কথা,
উর্বশী, তুমি তোমার আঁধারে আমায় ঢেকো,
সুমুখে অনেক রাত।

নীলিমাকে

রাত্রিতে জেগে ওঠে যে সাগর
অন্ধকারের সাগর—
তুমি তাতে স্নান করে এস, নীলিমা,
তোমার চোখ হোক আরো নীল,
চুল হোক ধূসর ফুলের মঞ্জরির মতো।

আর যদি রাত্রিকে বিদীর্ণ করে ওঠে চাঁদ।
তোমার আঁচলে লেপে থাকে যেন সিক্ত জ্যোৎস্না
তোমার বুকে পাই যেন জ্যোৎস্নার গন্ধ ;
বলতে পার, সে জ্যোৎস্না কি নীল হবে নীলিমা,
নীল পাখির পালকের মতো?

জানি, তুমি আমায় ডাকবে—
(নীল বন কি কথা কয়ে উঠল—
আর মেঘের গায়ে-গায়ে নেমে এল স্বপ্নরা?)
আমার চোখ নরম হয়ে আসবে ঘুমে, নীলিমা,
তোমাকে নয়, তোমার স্বপ্নকে পেয়ে।

পদ্মাকে

ভোরের চাঁদ পদ্মমধুর মতো লাল :
সারা রাত সে কি তোমায় জড়িয়েছিল, পদ্মা?
যেমনি জড়িয়ে থাকে কুঙ্কুমের ফুল
কাশ্মীরি মেয়ের নিটোল আঙুলে!

জানতে পারনি, পদ্মা,
কাল এসেছিল হাওয়া—
তোমার চুলের মতো নরম আর ঠাণ্ডা—
ভেঙে দিল আমার রুপালি তন্দ্রা।
উঠে আমি দাঁড়িয়েছিলুম চাঁদের মুখোমুখি,
আর তোমার গায়ে পড়েছিল আমার দীর্ঘ ছায়া,
সে ছায়াই কি তোমায় রাখেনি ঘিরে, পদ্মা,
আর স্বপ্ন করেনি নিবিড়?
তবু কেন ভোরের চাঁদ পদ্মমধুর মতো লাল?

সাবিত্রীকে

ওদের গায়ে লাগে মাছের রুপোলি নরম বুক
আর ভেজামাটির নরম ঠাণ্ডা :
তবু ওরা উঠে আসে সূর্যের পানে
জলের ঘাসগুলো।

জ্যোৎস্নার মেঘ জমে আছে তোমার বুকে
ছায়া গলে পড়েছে তোমার চোখে—
রাতের নীল ছায়া।
তবু কি সূর্যকে ভুলতে পারনি, সাবিত্রী?

রক্তের স্রোতে
কেঁপে কি উঠছে তবু উত্তাপের কান্না?
বল—
নিশ্চেতন রাত কি তোমাব দুশ্চর তপস্যা।
সূর্যের সোনালি মুহূর্তে শুধু জাগবার জন্যে?

নিশীথ-নগরী

যে রাজপথে চলে ট্রাম
ডবল-ডেকার আর লরি
আর মুখ বুজে যে শুয়ে থাকে
কান্নায় সে-ই বিদীর্ণ হয়ে গেল
একটা খড়-বোঝাই গরুর গাড়ির চলায়
রাত তিনটায়।
জেগে আছে পার্কে গ্যাসের নীল আলো
গাছের সবুজ আয়নায় চুপি-চুপি মুখ দেখবে বলে।

এখুনি জেগে উঠবে না কি রাজকন্যা
জীবন-কাঠির ছোঁয়ায়?
দিগন্তে তার কালো চুল ছড়িয়ে গেছে
যেখানে নেই তারা ;
হাওয়া বুঝি তার নিঃশ্বাসে ভরে গেল
যদি হাওয়াই তাকে বল ;

দেখ তো কোনো পাখি ডেকে উঠেছে কি না
হতেও পারে সে তার হীরামন।
বেজে উঠল হঠাৎ মোটরের তীক্ষ্ণ হর্ন—
মিথ্যে কথা, রাজকন্যা তো জাগেনি।

মেঘকুমারী

আছে কি মেঘে মেঘকুমারী
আকাশে যারা শুকায় চুল—

আর চাঁদের কাছে এগিয়ে যায় চুপি-চুপি

সাগরে নেমে মেঘেরা যখন করে স্নান
জল কি ওঠে না সাপের মতো ঝিলকিয়ে?
ঢেউ তো ওরা নয়
হয়তো ওরাই মেঘকুমারী।
ওরা কি নেমে আসে না মাটিতে
আকাশে যদি না থাকে চাঁদ?
যায় না তোমার জানালার জুঁইলতাগুলো ছুঁয়ে
ছায়ার মতো নরম আঙুলে?

আর তাইতে বুঝি ভোরে জেগে দেখ—
ফুটে আছে জুঁইফুল।

জ্যোৎস্নায়

আজ চোখে ঘুম নাই। আকাশেরো ঘুম নাই যেন।
নরম ঘুমের মতো জ্যোৎস্না জেগে রয়।
ভেবে দেখ একবার—এমনি মদির জ্যোৎস্নারাতে
মালিনীর স্তব্ধ জল কেঁপেছিল রুপালি বাতাসে,
উটজে ফেরেনি শকুন্তলা,
চেয়ে আছে কোন্ পথে এসেছিল দুষ্মন্তের রথ।
সমুদ্র-সৈকতে এসে এমনি জ্যোৎস্নায়

দাঁড়ায়ে কেঁদেছে ডিডো, কার্থেজের স্বপ্ন চোখে তার।
সেদিনো-এমনি ছিল স্বচ্ছ জ্যোৎস্নারাত—
ট্রয়ের পাষাণপুরী পরিশ্রান্ত পশুর মতন
ঘুমায়ে পড়েছে ; শুধু জেগে আছে হেলেনের চোখ—
জেগে আছে—দ্রুতগতি সমুদ্রের পাখির পালকে,
জেগে আছে—দূরান্তের অর্ধস্ফুট ঢেউয়ের সংগীতে!

ঘুম! আজ না-ই হল ঘুম! থাকো জেগে।
এই রাতে ঘুমায়নি ইসুফ জুলেখা।
নেমে এস অবিশ্রান্ত জ্যোৎস্নার বর্ষণে ;
নগ্ন আকাশের তলে অসহ্য নূতন
প্রথম প্রেমের মতো স্পর্শ জাগে নিঝুম জ্যোৎস্নায়।
আজ আর না-ই হল ঘুম!

ভোর

কখনো বাইরে দাঁড়ায়েছ এসে ঘুমের চোখে
নরম ভোরে?
দেখনি আকাশ বোবা হয়ে আছে শিখেনি ভাষা
আলো এসে গেছে আসেনি আভা!
ঘুমিয়ে রয়েছ, কতবার এল এমন ভোর
এমন আলো!—
পরীরা যখন দল বেঁধে নামে স্বপ্ন ছেড়ে
বনের ফাটিক ঝরনা তলে।

আফ্রোদিতির লঘু আনাগোনা বনের ধারে
শোনোনি বুঝি?—
পাপড়ি-হাতের নরম ছোঁয়ায় চমকে উঠে
অ্যাডোনিস্ হাসে ভোরের মতো।
এমনি ভোরেই তেপান্তরের মাঠের শেষে
গহনবনে
রাজকন্যার ঘন কালো চুল মেঘের মতো
রাজপুত্রের স্বপনে আসে।

এম্‌নি ভোরেই আসে একদিন ফুলের কথা
হাওয়ায় ভেসে :
"মোর সাত ভাই চম্পা জেগেছ?...হয়েছে ভোর"
ঘুম হতে জেগে পারুল ডাকে।
আরো কত কথা রুপালি বকের মালার মতো
আকাশে দোলে ;
আকাশের সেই স্বপ্নরা মরা মাটির সনে
মিশে আছে এই নরম ভোরে।

বন

হয়তো বা তুমি দেখনি কখনো গভীর বন
যেখানে লুকিয়ে আছে কবেকার রাতের ছায়া
এলানো যেখানে আকাশের হিম-নয়ন নীল—-
তেমন বন।

যে স্বপনগুলি চোখ হতে রাতে হারিয়ে যায়
তারা কথা কয় বনের নরম লতার ফুলে :
তারা যেন লঘু পালকের মতো, বনের মেঘ—
স্বপ্নগুলি।

হয়তো যখন তারা-ঝরে-পড়া অনেক রাত
অলস বাতাস ঘুমায় হ্রদের জলের মতো :
জাগর চোখের পাতায় তখন ছোঁয়ায় ঘুম
বনের হিম।

যদি কোনো দিন আকাশের তলে তোমার চুল
ভিজে ওঠে কালো নতুন মেঘের শীতল জলে
দেখো ছুঁয়ে যাবে কতদূর হতে তোমার বুক
গভীর বন।

স্বপ্নের দিনে

পৃথিবী যেখানে চাঁদ হয়ে গেছে সেখানে চল :
এই মরা চাঁদ কেমন লাগে!
পৃথিবীর নীল জ্যোৎস্না যেখানে ফুলের মতো
ঘন-বন-ছোঁয়া নয়ন মেলে।

ছায়া-পথে আছে মৃদু আভা হয়ে স্বপ্নগুলি
সহসা তাহারা কহিবে কথা ;
হয়তো তখন আকাশের মতো তুমি ও আমি
কথাগুলি বুকে কুড়ায়ে লব।

তখন হয়তো তুমি নেই আর নেই পৃথিবী,
ম্লান হয়ে আছি স্বপনে শুধু,
দূর হতে একা চেয়ে দেখ কোনো তারার চোখে
ছায়া-পথে তারা ফুটেছে কিনা।

এরোপ্লেন

দেখেছ তো কতদিন
দুপুর যে কাঁপে
কাঁপে গানের সুরের মতো।
আর দেখেছ
রোদের স্রোতে ঢেউ তুলে
উড়ে যায় পাখিরা।
মনে আছে সে দুপুরের কথা—
থাকবে তো মনে?

চাঁদের দিকে চাও যদি কোনোদিন
তোমার হাওয়ায় মেশে কোনো ফুলের গন্ধ
মনে করো সে দুপুরের কথা :
মনে করো দুপুরের আকাশ
নেমেছিল পাখির পালকে।

আজ কি আর পাবে সে দুপুর
কোথায় সে হারিয়ে গেছে কে জানে?

উড়ছে আকাশে এরোপ্লেন—
আর জানো?—
পাখিরা পুড়ে গেছে রোদের আগুনে।

ইলেক্‌ট্রিসিটি

বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি—
পুরোনো চাঁদে সেই পুরোনো জ্যোৎস্না
আর পুরোনো রজনীগন্ধার গন্ধ :
ওরা ফিরে-ফিরে আসে ফুলের উপর প্রজাপতির মতো।
দেখতে কি পাওনা—
তোমার হাজার বছর আগে ছিল যে আলো—
আজো তা ঠিক তেম্‌নি আছে!
বলতে কি পারে না—চাইনে তোমাদের।
সূর্য থেকে মুছে ফেলো সাত রঙ
—দেখ নতুন কারা আসে :
আকাশের নীল পাথর ঢেকে রেখেছে কাদের
—আসুক তারা বেরিয়ে—
ফিরিয়ে আনো মাটির যৌবন।

ফিরে যাই ঘরে
জ্বলছে যেখানে নতুন দানব
ইলেক্‌ট্রিসিটি।

শৃঙ্খল

দেখেছিলাম পাহাড় :
কালো পাথরের ঝরনা
জলের ঝরনায় হারিয়ে গেছে।
তোমার চুলে আছে সে পাহাড়ের স্মৃতি
গায়ে জলের স্বাদ।
তবু তুমি ধরে রাখ পৃথিবীতে :
ঈগল উড়ে যাবে না
আকাশের নিঃসীমতায়।

মুমূর্ষু

আমরা পাইনি এসে পৃথিবীর প্রথম যৌবন :
আকাশে হারিয়ে গেছে কত কথা তরুণ তারার—
কত নীল অন্ধকার, ম্লান কত সূর্যের স্বপন—
জ্যোৎস্নায় জাগর রাত, রাতেরও তা মনে নেই আর।

আমরা পাইনি দেহে অরণ্যের সবুজ আঘ্রাণ :
হয়তো ফুটেছে ফুলে কোনোদিন মৃত্তিকার মন ;
আমাদের ধমনীর ভীত রক্ত করেনি সন্ধান—
সিংহের পিঙ্গল ছায়া মিশে গেছে কোথায় কখন!

আমরা পাইনি মনে পর্বতের অভ্রভেদী সুর :
পার্বতীর পঞ্চতপ ভুলে গেছে বুঝি হিমাচল ;
আমরা জানি না কিছু বয়ে নিয়ে গেছে কত দূর
উর্বশীর দেহ-স্বাদ সমুদ্রের লবণাক্ত জল।

আমরা পেয়েছি শুধু পৃথিবীর অন্তিম দিবস,
নামে মৃত্যু পৃথিবীর জরাজীর্ণ ভগ্ন দেহময় ;
আমাদের পঙ্গু আত্মা পায় নিত্য মৃত্যুর পরশ
মানুষের ইতিহাস বুঝি আর হবে না অক্ষয়।

ভাঙা বন্দর

ভাঙা বন্দরে আমরা করেছি ভিড় :
এখানে জাহাজ নেই
দিগন্ত-পারে নেই সমুদ্রতীর।

সবাকার সাথে শেষ তার লেনদেন ;
বুঝি দূরে দুর্যোগ
সমুদ্রে শুধু কালোজল আর ফেন :
ভবিষ্যতের পথ আরো অস্থির।
ভাঙা বন্দরে আমরা করেছি ভিড়!

পৃথিবী-পিপাসা আমাদের জনতায়
যারা দুঃসাহসিক—

দুর্যোগে তারা পারাপার হতে চায়—
ভুলে ফেলে আসা জীর্ণ পুরোনো নীড়!
দিগন্ত-পারে কোথা সমুদ্র-তীর !

এখানে হয়তো স্মৃতি ভাঙা পৃথিবীর—
নির্মম পারাবার :
দিগন্ত-পারে নেই সমুদ্রতীর।
ভাঙা বন্দরে আমরা করেছি ভিড়!

আশ্বিন ১৩৪৬

যে আকাশে রঙ নেই, ওড়ে শুধু কালো এরোপ্লেন-
বিষের ধোঁয়ায় যার ছায়া আজ মৃত্যুর মতন—
যেখানে হয়েছে মেঘ আগুনের শিখার শরীর—
আমাদের রক্তে নেই ব্যথা, ভয় সেই পৃথিবীর!

নয় ম্লান আমাদের আশ্বিনের আকাশের দিন
নীলের শয্যায় আছে ফেনায়িত শ্বেতালস মেঘ—
বাতাসে পেয়েছি মৃদু সুরভিত শেফালিকা-স্বাদ—
আমরা কি বুঝি কোথা পৃথিবীর আদি আর্তনাদ?

কোথায় জ্বলেনি বাতি ভয়ের ছায়ায় অন্ধকার—
মাটির সোনালি শস্য ভস্ম হয়ে ওড়ে অহর্নিশ—
সহস্র মায়ের চোখ সন্তানের মৃত্যু-স্বপ্নময়—
কোথায় মানুষে আর মানুষের নেই পরিচয়!

আমরা দেখিনি সেই মারণের মরণের পণ—
অশ্রুজলে পরিপূর্ণ প্রতি মুহূর্তের ইতিহাস!
আমাদের রাত্রি আসে সুপ্তি আর স্বপ্নে সুমধুর—
বিনিদ্র যাদের চোখ তারা বুঝি যাবে বহুদূর!

অনাগত

সূর্য তোমার গেল না কুজ্ঝটিকা
স্বপ্ন হল না শেষ :
এখনো আকাশে অনেক অন্ধকার—
রাত্রি অনুর্বর।

আলোর ছায়ারা অশরীরী মরীচিকা
তাদেরি লেগেছে ঢেউ,
প্রভাত পায়নি পৃথিবীর উপকূল
এখানে এখনো ঘুম।

লোনা সমুদ্রে আদিম উদ্দামতা
মেরু-শৈশব হিম,
আলোর ক্ষুধার ধূসর আর্তনাদ—
বুঝি তবু শোনা যায়—

সে ধ্বনি মরেছে লক্ষ অশ্বখুরে
ধূলি-তলে বারবার
অগ্ন্যুৎপাতে তার ক্ষীণ উত্তাপ
হয়তো ভস্মশেষ!

ভস্ম-বর্ণে রাত্রি কি অবশেষে
প্রদোষে পাবে না রূপ?
কখন সূর্য তোমার নীহারিকায়
সত্য সূর্যোদয়!

অনেক আলোতে ফসলের শ্যামলিমা
ইস্পাত ঝলমল—
মূর্ছিত সেই প্রথম সূর্য-স্বাদ
পৃথিবীর যৌবন।

ঘাম

আর ফুলের গন্ধ নয়, পৃথিবী,
ভালো লাগে এবার
ঘামের গন্ধ—
তোমাকে পীড়ন করে
মানুষের দেহের যে পুলকাশ্রু!
ঘামের রুপালি জল
তোমার জলের চেয়ে ঠাণ্ডা, আকাশ,
ঠাণ্ডা, সুন্দর আর পবিত্র।
জন-সমুদ্রের লোনা জল
প্রচুর তার দুরন্ততা, সাগর,
তোমার উত্তাল লোনা ঢেউয়ের চেয়ে।

ঘামের দামে আমরা পেয়েছি
অজস্র সবুজ শস্য
অফুরন্ত সূর্যময় কয়লা
আর শক্তিময় শ্বেত ইস্পাত!
জীর্ণ পৃথিবীর দেহ কুঁদে
ঘর্মাক্ত শিল্পীর হাতুড়ি
তৈরি করে পৃথিবীর
নূতন প্রতিমা।

শহর

অরণ্যের স্বপ্ন দেখবেনা শহর কোনোদিন।
ঘুম তার সবুজ হয়ে ওঠেনা ফসলের রঙে,
শহরের ধূসর স্বপ্নে আসে ছায়ারা—
অতিকায় আসন্ন যন্ত্রের মূর্তিগুলো।
তামার স্নায়ুতে আর নয় বিদ্যুৎ
করবে সে আকর্ষণ অণুর ভ্রূণ-শক্তি
নিবিড় হবে সূর্যের সঙ্গে পরিচয়।
ভেঙে দেবে সে ঈশ্বরের প্রতিমা
অতীত পৃথিবী প্রলুব্ধ ছিল যাতে—

পাঠাবে সে পৃথিবীর প্রথম উদ্ধত জিজ্ঞাসা
বুদ্ধি তার পৌঁছবে একদিন বস্তুর নিশ্চিত শেষ প্রান্তে।

সে শহরের স্বপ্নে আমরা চলেছি
শুভ্রতায় গর্বিত শহর,
শোষণের নিশান তার
ভিক্ষুকের অক্ষম দেহে
গণিকার নিষ্প্রভ চোখে
নেই জীবনের অবিরাম মৃত্যুস্তুতি,
মানুষের অজস্র প্রয়োজন সেখানে অজস্র আয়োজনে সমাপ্ত।

মাটি

মাটি হতে নিয়ে গেছে যাযাবর মানুষেরা যব আর ধান
কিছু তার ফেলে গেছে পথে কিছু সমুদ্রের জলে,
তারপর মরুভূমি বেয়ে চলে মানুষের ক্লান্ত ক্যারাভান
কোথায় কুমারী মাটি ভারাতুর আসন্ন ফসলে।

প্রাচীন মাটিতে আজ ভাঙা হল, ভুসি আর পশুর কঙ্কাল
হে রাজা, তোমার আয়ু নিভে যায় আগন্তুক ঝড়ে,
শতচ্ছিন্ন উত্তরীয় ওড়ে, ম্লান উষ্ণীষে পড়েছে উর্ণাজাল
তোমার সীমান্ত ছেড়ে যায় প্রজা বিদেশী নগরে।

নগরের দীর্ঘদেহ আকাশে পাঠায় বুঝি আলোর সঙ্কেত
মাটির ছেলেরা আসে পতঙ্গের মতো প্রলোভনে
বহুদূরে ফেলে স্তব্ধ অন্ধকার আর বন্ধ্যা ফসলের ক্ষেত
যেখানে অনেক রাজা বসেছে সোনার সিংহাসনে।

এ নূতন রাজধানী—ধমনীতে চলে তার বিদ্যুতের স্রোত
লোহার ফসল হয় রক্তে আর ঘামে শুধু বোনা,
বন্দরের ঘোলা জলে কোলাহল করে বহু বণিকের পোত
এখানে খনির মাটি ইন্দ্রজালে হয়ে যায় সোনা।

তবু কোনো রাত্রিশেষে যখন তরুণ সূর্যে দিকপ্রান্ত লাল
তারা কি দেখেনি স্বপ্ন মাটি ছেড়ে এল যারা চলে—
উর্বর করেছে মাটি তাদের দেহের স্তূপ বুঝি কতকাল
তারপর পৃথিবীকে পেল তারা মাটির বদলে।

মেঘ-জ্যোৎস্নায়

চুপি-চুপি কথা কয়েছে কখনো লাজুক মেয়ে
বাদলের ভেজা আকাশ-তলে জ্যোৎস্না-রাতে?
চোখে এসে তার খয়েরি চুলের নরম ছোঁয়া
অবশ আলসে ঘুমের মতো পড়েনি ঢলে?

হয়তো আকাশে সবখানি চাঁদ যায় না দেখা
জ্যোৎস্নারা লঘু মেঘের বুকে ঘুমিয়ে আছে ;
কিউপিড তার সাইকিরে বুকে জড়ায় যদি
স্বপ্ন-মেদুর ছায়ার আভা এমনি হবে।

হয়তো মেঘের ওপারেব দেশ মেরুর মতো
নিথর শীতল আলোয় রচা বিচিত্রতা,
স্বচ্ছ দেহের মৃদুভার রেখে ফুলের 'পরে
পাঠায় স্বপ্ন মাটির চোখে পরীরা যত!

ভুলেছিলে, এল কত রাত মেঘে ফেনিল ঘন
বুঝি দোর হতে ফিরেছে কেঁদে কত না রাত,
ভাঙেনি তন্দ্রা শুনেও বুঝিবা তাদের কথা
যারা এসেছিল কনক-চাঁপা খোঁপায় গুঁজে।

সে-ছবি হয়তো হারিয়ে গিয়েছে আকাশে দূরে
তবু পাবে তার আবেশটুকু জ্যোৎস্না-মেখে—
যদি কোনো দিন কয় যা বলেনি এমন কথা
বাদলের ভেজা আকাশ-তলে লাজুক মেয়ে।

নদী

নদীর জলে
ঢেউ নয় ওরা পাখিরাই বুঝি মেলেছে পাখা :
রুপা হয়ে আছে আকাশের রোদে চরের বালু
অনেক দূরে।

কখনো ভুলে
তুমি আর আমি দেখিনি সে ভীরু নির্জনতা
তারা শুধু একা—নদী আর চর, আকাশ, আলো
ভোরের মতো।

দুপুর বেলা
সেখানেও পড়ে অলস মেঘের নরম ছায়া,
জ্যোৎস্নাও বুঝি চায় কোনোদিন মুখর হতে
গভীব রাতে!

বুঝিবা চায়
বোবা নদী আর আকাশ তখন কহিতে কথা,
তবু পাছে কেউ শুনে ফেলে তাই অমনি তারা
ঘুমিয়ে পড়ে।

মেঘ

মেঘে ছায়া-ঘন হল আকাশের দিন,
পৃথিবীতে আজ তমাল হয়েছে কালো :
তোমাদের দেহ-যমুনায় বল, রাধা,
কাঁদে না ঊর্মিমালা?

বন বুঝি মেঘে গহন হয়েছে আরো,
কার নীল চোখ হারায়েছে নীল বনে!—
তোমাদের কত ঊর্মিলা জাগে রাত
রাজ-পালঙ্কে বসে!

একা আরো কত জেগেছ মেঘের রাত
কোন্ তপোবনে তোমরা, শকুন্তলা ;
মালিনীর জলে সেখানে ভাসেনি কেয়া
আসেনি বিজয়ী রাজা।

হিমগিরি হতে মেঘের ধ্বনি কি শোনো?
উমা, তোমাদের দেবতা মেলেনি আঁখি !
কত যুগ গেল যাবে আরো কত যুগ
কত মেঘ, কত ব্যথা!

রূপান্তর

এখানে কোকিল ডাকে,
মহুয়ার শ্বাসে হাওয়া ভারী হয়ে থাকে ;
আকাশে অনেক বড় চাঁদ,
ঝাঁঝালো দুপুর ভরা ঘুমের আস্বাদ ;
এখানে আসেনি যুদ্ধ হাজার বছর—
কেবল মাটির গায়ে ধানের শিকড়
বুলায়ে গিয়েছে দিনরাত
শিশুর মতন মৃদু কচি-কচি হাত।

এ বসন্ত, এই আলো, পুরোনো দিনেরা
ধানের বাতাস আর ঘুম দিয়ে ঘেরা
জাগে আজ মৃত্যুর ছায়ায়,
আকাশ কান্নায় ফেটে যায়
বিমানের পাখার ইস্পাতে—
পৃথিবীকে চূর্ণ করে উড়ায় হাওয়াতে
লরির সারির সরীসৃপ—
সবুজ সমুদ্র ভরে জেগে ওঠে সৈন্যের ধূসর মেটে দ্বীপ।

তবু তা-ই ভালো :
এ ভূখণ্ড চেনে শুধু এক সূর্য আর তার আলো,
সে আলো এবার মুছে যাক।
সাদা বক উড়ে গেছে এখন উড়ুক কালো কাক।

প্রেতায়িত

আমাদের জীবন থেকে
ছিনিয়ে নাও, দেবতা,
তোমার সূর্যকে—
যে শুধু আমাদের শঙ্কিত আয়ুর বিধাতা—
আর কিছু নয়।
ঝরে পড়ুক সূর্যের ঔজ্জ্বল্য
পাহাড়ের তুষারে,
আনুক সে প্রভাত অরণ্যের জন্যে—

আমাদের জীবন থেকে
নিয়ে যাও তার ব্যর্থতা।

নিয়ে যাও তোমার আকাশ, দেবতা,
তারার জ্যোৎস্নায়
কোরো না আর সুদূরের ইশারা :
মাটির গন্ধ আমাদের রক্তে
দেহে বিসর্পিত শুধু কবরের অন্ধকার।

এ পৃথিবী কেন আমাদের দিলে, দেবতা,
দিলে মেঘের রঙ আর নদীর ছায়া!
সমুদ্র থেকে হাওয়া আসে
দক্ষিণ দ্বীপের পদ্ম-গন্ধ নিয়ে
নিয়ে আসে জল-ঘাসের ঘ্রাণ
আর ঢেউয়ের দুরন্ততা!

আমাদের রক্ত কেন আজো ঝরে পড়তে চায়
ফুলের অজস্র মঞ্জরীতে?
কেন মেয়েরা চায় কালো চোখে—
কালো চুলে নিবিড় করে আনে রাত
—আর ভালোবাসা?

দাও আমাদের আকাশকে ইস্পাতে মুড়ে—
বিদ্যুতে জ্বলুক আমাদের সূর্য,
কার্বন-ডায়োক্সাইডে ভরে যাক হাওয়া,
আমার বেঁচে থাকি ক্লাইভ স্ট্রিটের দালানে
বেঁচে থাকি কংগ্রেসে আর সিনেমায়।
তুমি মরে যাও দেবতা—
ভরে উঠুক আমাদের নতুন পৃথিবী
তোমার প্রেতাত্মার দীর্ঘশ্বাসে।।

সমতল

যাত্রীরা এল বহুদূর
পাহাড়ে গিয়েছে চাঁদ অস্ত,
এখানে যে মাটি সমতল—
মনে তবু পাহাড়ের স্বপ্ন।

আকাশের রহস্যময়
ছিল কোন কাঞ্চনজঙ্ঘা
সেখানে দাঁড়িয়েছিল কেউ—
বন্দনা করে গেছে সূর্য।

সে স্মৃতির ঘন সৌরভ
সঞ্চিত যাত্রীর রক্তে,
সেখানে মেশেনি যেন আর
দীর্ঘ পথের ধূলি-বাত্যা।

এখানে তো মাটি সমতল
সমতল সকলের তৃষ্ণা—
এখন যে অনেকের ভিড়
অনেকের হাসি আর অশ্রু।

আকাশ আহত নয় আর
তীক্ষ্ণ অভ্রভেদী শৃঙ্গে—
এ পাখির পাখার হাওয়ায়
সরে গেছে দূরে দিক-চক্র।

আঁকা ফসলের তুলিকায়
উজ্জ্বল দিনে কত বর্ণ,
ছায়া কি আনবে তবু রাত—
পাহাড়ে যে গেল চাঁদ অস্ত।

পামীর

পামীরের হৃদ্‌পিণ্ড পাঠায়েছে গৈরিকের স্রোত
দিক হতে দিগন্ত আকাশে।
এশিয়ার যে-আকাশে পাহাড়ের পিঙ্গল আস্বাদ-
সে-আকাশ নেমে আসে মনে।

হিমালয় সূর্যোদয়ে মেলেছিল পাখা
ফিরে গেছে দক্ষিণ সাগরে

ছুঁয়ে গেছে বুকে
সূর্যকুমারীর নগ্ন বুক ;
তবু যাত্রা হয়নি তো শেষ,
প্রশান্ত সাগর শেষে
তবু রয় অশান্ত পিপাসা ;
এখানে আগ্নেয়গিরি ফুজি।

আসে পামীরের মনে তিব্বতের কস্তুরি-নিঃশ্বাস
জ্যোৎস্নায় কুয়েনলুনে আসে হরিণেরা
হৃদপিণ্ডে বাজে তার ধ্বনি।

ককেশাস আলত্যনে বেঁচে আছে কারা যাযাবর
ধমনীতে পুরোনো পৃথিবী—
কুয়াশা-ধূসর চোখে পামীরের স্বপ্ন সীমাহীন ;
কবে ডেকে গেছে দূরে পশ্চিমের দিকপ্রান্ত তারে
কত বন ছায়ায় মদির
কত যে সজল মাটি নদীর ছোঁয়ায়
রেখে গেছে পদক্ষেপ তার!
তার আলবুরুজের চূড়া
রাঙা হয়ে গেছে শেষে সূর্যের সোনায়।

তেমনি হয়েছে লাল আলতাই পাহাড়ের শ্রেণী
কোন্ সূর্য ডুবে গেছে আজ
আগন্তুক কোন্ সূর্য লাল।
লাল হল পামীরের শিরার গৈরিক।

আমাদের রক্ত শুধু হতে চায় নীল।
নীল চোখে স্বপ্ন খুঁজি চন্দ্র-নীল রাত্রির ছায়ায়!
তবু একদিন
এশিয়ার যে-আকাশে পাহাড়ের পিঙ্গল আস্বাদ
সে-আকাশ নেমে আসে মনে॥

বর্তমান

আবারো সে সূর্য আসে—কত ক্ষয় হয়ে গেলে পর,
এ আলো নূতন আলো—প্রাক্তন সে বিদ্যুতাণুগুলি
কোথায় হারিয়ে গেছে হয়ে সময়ের পথ-ধূলি,
এখনো সূর্যকে তবু পায় পল্লী, প্রান্তর শহর

প্রথম বিস্ময় যেন। আমাদের ভবিষ্যৎ নেই :
নপুংসক বর্তমান ক্রুদ্ধ রাসায়নিকের মতো
রক্তময় অতীতের বীজাণু মিশায় অবিরত,
প্রেতের ছায়াকে নিয়ে মরি শেষে সেই ছায়াতেই

কোনোদিন। তবু জানি কোনোদিন এসেছে প্রভাত
কারো মনে, ধমনীর নদী যার চেয়েছে মোহনা—
ভবিষ্যৎ সমুদ্রেরে দিতে হবে প্রতি জল-কণা—
যৌনতার মতো তীব্র এই স্বপ্নে কেটে গেছে রাত

কারো চোখে নিদ্রাহীন। কিছু আলো তবু ভবিষ্যৎ
দিয়েছিল সেই সব পৃথিবীর সন্তানেরে একা,
জ্যামিতিক শহরের চিত্রে তারি ত্রিভুজের রেখা ;
ছায়াও অনেক পয়ঃপ্রণালীর মতো রুগ্‌ণ পথ

এনে দেয় শীর্ণ ঘরে, কঙ্কালের শিরায়-শিরায়।
এখন ধূসর দিনে সেই আলো সেই ছায়া লেগে
কোনো লাল আলো দেখে এখনো উঠিনি যেন জেগে
এখনো ঘুমের চোখে বিস্মৃত আলোরা আসে যায় ;

হলুদ শিখায় আসে হোমাগ্নির মৃত তপোবন,
মনুর শানিত অনুশাসনের অক্ষরে আহত
চলে শীর্ণ যাত্রীদল ; এখনো মাটির নীড় কত
জ্বেলে দেয় শঙ্করের আকাশপ্রদীপ। এ জীবন

পেছনে তাকায় শুধু করেনি কখনো আবিষ্কার
সম্মুখের জীবনেরে, —রাত্রির স্বপ্নের ব্যর্থ বোঝা
দীর্ঘ দিন বয়ে শেষে শেষ হয় আপনারে খোঁজা,
দ্বারে ডেকে ফিরে যায় পৃথিবীর ক্ষুধা বার-বার।

অনেক আলোর ক্ষুধা অসমাপ্ত চিত্রে পৃথিবীর।
এ আলো নূতন আলো-কোনো শিল্পী পারে এনে দিতে
ইস্পাতে, শস্যের ক্ষেতে, মানুষের অজস্র হাসিতে
তখন পৃথিবী সূর্য প্রতিদিন উজ্জ্বল, অস্থির ॥

ঘুম

সাগরে পাহাড়ে ঘেরা আমাদের বন্দীশালা,
আরো যে আকাশ আছে দিগন্তে ভুলেছি আজ—
কত নীল বন অজানা কত বা গেরুয়া মাটি
আছে আমাদের রক্তে—হয়তো ঘুমিয়ে আছে।

মানুষের সেই তরুণ দিনেরে স্মরণ করি :
সিন্ধুর মোহনায় শুনি কার পদধ্বনি,
গঙ্গার তীরে-তীরে ফসলের স্বপ্ন জাগে,—
সুমেরে বুঝি বা এসেছে তখন দূরের তৃষা।

'তাকলামাকান' মরুতে উড়েছে রুপালি বালু—
কাদের সোনালি চুল উড়ে হল ঝড়ের শিখা—
কোথায় ফসল কোথায় শ্যামল স্নিগ্ধ মাটি!
ডেকে নিল তাই নর্মদা আর গঙ্গা-নদী।

কার্থেপিয়ার ঘন বন হতে বাইরে এসে
সূর্যেরে যারা জানাতে চেয়েছে নমস্কার
তাদের যাত্রা সপ্তসিন্ধু করেছে শেষ—
আর্যেরা দেখে ইন্দ্রের ছায়া আকাশময়।

কালো হয়ে জমে আছে দক্ষিণ দ্বীপের ঋণ,
এখনো মুছে যায়নি চীনের হলুদ ঘ্রাণ—
আরো কত মন কত ইতিহাস, অপরিচিত
আমাদের মনে, শিরায়-শিরায় ঘুমিয়ে আছে ॥

বাংলাদেশ

গাছের ছায়ারা ভিজে কালো করে দিয়ে যায় জল
সেখানে কচুরিপানা সবুজ ঝিনুকে তবু করে ঝলমল,
যেটুকু বা আছে অবকাশ—
বাঁশঝোপে এলোমেলো ঘোলাটে আকাশ।
তারপর
মাটির নরম স্রোত নদী হয়ে ভাঙে পাড়, গড়ে বালুচর—
আবার বাংলার ছবি ধানের রোমশ দেহে জেগে ওঠে—
চাষী বাঁধে ঘর।

সীমান্তে যে গেরুয়া দেয়াল
মাটির আগুন যারে মাটি হতে দূরে ধরে রাখে চিরকাল,
তারো গায়ে সবুজেরা মেলে দেয় পাখা—
সেখানে ধানের গান—সেখানে বলাকা।
নীরব আকাশ যেন কোথা হতে ডাহুকের ডাক নিয়ে আসে—
বাঘের নখের দাগ ডুবে যায় পাহাড়ের ঘাসে—
গাছে-গাছে ওড়ে শুধু এখন হলুদ হরিয়াল!

সজল মাটির জয়
আমাদেরো মনে-মনে—শিখিনি সংশয়,
শিখিনি আকাশে দিতে পৃথিবীর ক্ষুধার উত্তাপ
ইস্পাতের দৃঢ় বর্মে আপনারে ঢেকে দেয়া
ভেবেছি এ শতাব্দীর শাপ:

নিরুত্তেজ সমতল নদীর ধমনী
শোনেনি হৃদয়ে কোনো পিপাসার ধ্বনি—
জানেনি যে মানুষের আরো আছে কথা—
পেশীতে অনেক চঞ্চলতা

দিয়ে গেছে বিদ্যুতের অগ্নিময় স্নায়ু।
তাই আমাদের ভীরু ক্লান্ত পরমায়ু
নিস্তরঙ্গ নদী দিয়ে
ধানের নৌকার মতো পাল তুলে যায় শুধু দিগন্তে মিলিয়ে॥

কস্মৈ দেবায়

কোন্ দেবতারে জানাই নমস্কার?
মাঠ হতে ধান নিয়েছিল যারা আর
মুকুটে যাদের অনেক ধানের রঙ
সন্ধ্যার গায়ে তাদের ছায়ার সার!

নরমেদ যারা নিতে এল তারপর
লৌহ-বর্মে যাদের বুক পাথর
অপরাহ্ণের আকাশে তাদের ভিড়
ভেঙে গেছে বুঝি নিরাপদ খেলাঘর।

কোন্ দেবতারা বাজায় রুদ্রবীণ
আগুন ছড়ায় তাদের মধ্যদিন,
সূর্যের ক্ষত অবিরত ঢালে বিষ—
আছে আমাদের মৃত্যুর মহাঋণ!

এখনো তবু উষার আকাশ লাল
জীবনের যেন নূতন রশ্মি-জাল!
কোনো দেবতার ধ্বনি কি শুনতে পাই?
আমাদের হবি চায় কোন্ মহাকাল!

অভীপ্সা

মাটির গৈরিকে রাঙা তোমার সে উচ্ছল যৌবন
আমার শরীরে ঢালো। প্রভাতের পরিচ্ছন্ন মন,
মধ্যাহ্নসূর্যের পেশী, সায়াহ্নের অবসন্ন চোখ
আমার রক্তের স্রোতে অবিরত সঞ্চারিত হোক—
রাত্রি হোক রাত্রিময় অন্ধকারে অগাধ নিবিড়,
মাটির দুহিতা, আনো দেহছায়ে ঘুম-ঘন নীড়।

তোমার শরীর হতে আসে তেজ তরুণ তারার—
ইস্পাতের মেয়ে, দেহে করি অভাবিত আবিষ্কার

নূতন ক্ষুধার ঘ্রাণ। আছে রুদ্ধ তোমার পেশীতে
সমুদ্রের মত্ত স্বাদ প্লাবিত ঝঙ্কার নৃত্য-গীতে,
আছে রুদ্ধ অন্তর্গূঢ় খনির উত্তাপ আর হিম ;
জানে দৃষ্টি পৃথিবীর আকাশের কোথায় অন্তিম।

অনেক মসৃণ ত্বকে মৃদুতার স্বপ্ন অবশেষে
তোমরা করেছ ভিড় জীবনের কাছাকাছি এসে।

মাটি ও মানুষ

এমনি তো ছিল মাটি ;
এই নদী মেটে জলে ধূসর উদাস,
শিরশির করে তার তীরে-তীরে কাশ—
বয় সেই একই বাতাস ;
আছে সেই বন—
মাটির আকাশ-ছোঁয়া পণ,
দিগন্তের মেঘের মতন ;
এমনি তো ধান—
মাটির পাখির এই পুরোনো পালক,
নিয়ে তার ঘ্রাণ
উড়ে গেল বক
সময়ের আকাশে-আকাশে—
প্রাক-ইতিহাসে।

পীত, ভীত, মৃত মানুষেরা
করে যায় চলাফেরা
দলে-দলে
এই আকাশের তলে,
কাঁচা মাটি আর কচি ধানে!

তবু জানি সূর্যে ঝিলিমিল
মানুষের অনেক মিছিল
ছিল এইখানে :
নরম মাটির দেহে আঁকা

ছিল সিক্ত কত রক্তরাগ—
কঠিন পায়ের কত দাগ.
ঝির-ঝির বাতাসের পাখা
ছুঁয়ে গেছে কত কণ্ঠনাদ,
সেইদিন এই ধান
পেয়েছিল মানুষের পেশীতে সম্মান,
সেইদিনও উঠে গেছে চাঁদ
নিয়ে আলোছায়ার মিতালি—
নদীতে ছিল না শুধু এই ভাটিয়ালি
ছিল জয়গান ॥

ক্রিমিয়া যুদ্ধের পর

অনেক সীমান্তে আজো পড়ে আছে মানুষের শব—
অনেক সীমান্তে আছে মানুষের আগুনের শিখা—
পৃথিবী তাদের কাছে চেয়েছিল আশা।
যারা করে কলরব
টানে যবনিকা
নেপথ্যের লোক তারা, বলে শুধু নেপথ্যের ভাষা ;
তবু আজ তারা অভিনেতা,
আশা পরাজিত আর দুরাশা বিজেতা!

আশা তবু বেঁচে রয় পৃথিবীর হাওয়ায় কোথায়—
সীমান্ত-প্রহরী যারা ধীরে-ধীরে দূরে সরে যায়—
তারপর সীমা নেই আর—
পাহাড় কোথায় শেষ নেই তো ঠিকানা—
নামহীন নদী, শুধু নদী বলে যায় তারে জানা,
এখানেও এসে মেশে দূরের রাত্রির অন্ধকার।
আশা বেঁচে থাকে তৃণে-তৃণে,
প্রান্তরের ফসলের গায়,
বেঁচে থাকে অন্য কোনো দিনে।

সেদিন কে মনে রাখে সীমান্ত কোথায় ছিল আর সে কেমন—
জানে শুধু একদিন আগুনের মতো ছিল কোনো-কোনো
মানুষের মন !

পৃথিবীকে

তোমার মাটির ঘ্রাণ, তোমার জলের স্বাদ, তোমার আলোর আলিঙ্গন,
পেয়েছি জীবন ভরে, তা-ই কি আমার সব—তাতেই সকল পাওয়া হল?
তাতেই কি ছোঁয়া হল অরণ্যের আকুলতা, অঙ্কুরের অগাধ কামনা—
নরম-নরম ফুল, ফুলের নরম ত্বক তারো চেয়ে নরম যে মন?

পেয়েছি কি জীবনের ছায়ার কুহকময় অলস রুপালি গতি-রেখা—
মাছের সমুদ্র-দিন, দিনের নরম ছোঁয়া, দিনের শীতল অতলতা?
জেনেছি কি কত দূর—পাখির বুকের দূর, পাখির মনের দূর কোথা?
পাইনি সে জীবনের অগাধ পিপাসাগুলো, হয়নি তো তার ভাষা শেখা!

হাত দিয়ে ছুঁয়ে গেছি মানুষেরে, মানুষীরে, চেনা কি হয়েছে তবু তারা?
আমার মনের ঢেউ তাদের মনের তটে মিছিমিছি করে গেছে খেলা!
আসেনি নিবিড় হয়ে দেহের নরম স্বাদে তারা তো আমার দেহময়,
চলে গেছি তাই যেন তোমার জীবন থেকে, সঙ্গীহীন, হারায়ে ইশারা।

আকস্মিক

কতদিন
জলের ক্লান্ত নিশ্বাস
মেঘ হয়ে উঠেছে আকাশে।
আর একদিন
সে-মেঘ গেল স্বপ্ন হয়ে
পৃথিবীর আকাশ-ভরা নীল ঘুমে।
কেমন করে তা হয়?—
আমার দেহ
ফুলের গন্ধ হল কি করে?

পার্বতী

তোমার মুহূর্ত শুধু ছায়া-নীল শর্বরীর মতো
আপনারে ঢাকে বারে বারে

তুমি কি দিবে না তারে
সূর্যালোকে উজ্জ্বল উদ্ধত
মধ্যাহ্নের অগাধ আকাশ?—
দিবে না কি নিতে তারে বসন্তের সুরভি-নিশ্বাস—
শুক্লা চৈত্র-রাত্রির মদিরা?
হে পার্বতি, ছিন্ন কর নিষ্করুণ তুহিন-নির্মোক:
সমতলে সমুদ্রের ডাক বুঝি শুনেছে নদীরা—
তোমারো রক্তের স্বাদ লবণাক্ত হোক,
অগ্নির সঞ্চার লাভ করুক হিমার্ত ম্লান শিরা-উপশিরা।

শুনিতে পাওনা বুঝি মৃত সেই মুহূর্তের দল
কালের তরঙ্গে ফিরে
তোমার দেহের তীরে
কঙ্কালের কালিমায় করে রূঢ় আর্ত কোলাহল!
স্বপ্নহীন নয়ন তোমার
বন্ধ্যার বেদনাময়,
করে নাই মেঘোদয়ে বিদ্যুতের সার্থক সঞ্চয়;
যাহারে করেছ অস্বীকার—
শ্রাবণের নিদ্রাহীন সিক্ত অন্ধকার
আর শুভ্র আশ্বিনের বিস্মিত প্রভাত,
রজনীগন্ধার গন্ধ ফাল্গুনের প্রগল্‌ভ প্রদোষে
তারা কি তোমার মর্ম-কোষে
করে নাই জীবনের যবনিকা-পাত?

তারপর একদিন যে মুহূর্তগুলি
আসিত না এ লগ্নের রুদ্ধদ্বার খুলি
তারা এসে ভিড়িবে যখন—
ম্লান সূর্য, নক্ষত্রেরা খসে একে-একে—
মৌন নদী নিষ্পলক হ্রদের মতন—
সেদিন অলক্ষ্য কোন্‌ পাণ্ডুর পূর্ণিমাকাশ থেকে
যদি আসে জ্যোৎস্নার জোয়ার,
আসে রক্তে উর্বর আস্বাদ,
জাগে পীত নবাঙ্কুর জীবনে আবার—
তখন পাবে কি খুঁজে হারানো রাত্রির স্বপ্নসাধ?
চৈত্রের নিশাবসানে
রজনীগন্ধার কানে
অপরিচিতের নাম শুনিবে কেবল;
তোমার অপেক্ষা করে আগন্তুক কালবৈশাখীর কোলাহল॥

ওরা

তামাটে মাংসের ওপর ঝাঁকে-ঝাঁকে মাছি
এক টুক্‌রো তামার জন্যে হাত পাতে ওরা—
ন্যাকড়ায় ওদের ধুলোর গন্ধ
ঘামের গন্ধ আর ঘায়ের গন্ধ:
রাস্তার হাওয়ায় হোটেলের শিককাবাবের গন্ধ—
রাস্তার শানে ধোঁকে রোগা কুকুর আর ওরা।

বসন্ত এল—
এল লেকের জলে
এল কত মেয়ের কালো চোখে
বুঝিবা এল তোমার আমার রক্তের রঙে:
বসন্ত এল না কিন্তু ওদের!

শহরের বসন্ত ঘোরে
বুইক-বেঞ্জ-বেলিলার চাকায়—
ওরা তখন চেয়ে থাকে কাবাবের মাংসের দিকে
আর ওদের মাংসে ওড়ে মাছির ঝাঁক ॥

মানুষ

হে যুগ-দেবতা
নামাও এবার
শকটের আর অট্টালিকার
কটাহ থেকে,
নামাও মাটির ঠাণ্ডা গায়ে :
পৃথিবীর স্বাদে
আমাদের বুক
সাপের মতন উঠুক ভরে।
আঙুরের রসে তৈরি হবে না
পোশাকি রক্ত
তরল রক্ত
পোশাকি দেহে,

সোনালি ধানের রক্ত আসুক
আমাদের বুক
নদীর মতন উঠুক ভরে।

হে যুগ-দেবতা
আমাদের মন
মেয়েদের নীল চোখের ছায়ায়
অলস স্বপন
যেন না আনে,
পৌরুষ হাতে
নীল অরণ্য
মুছে ফেলি যেন
ডেকে আনি যেন
ধূসর মানুষ আর তার ক্ষুধা
ধূসরতর।
সূর্যের কোটি চূর্ণে গলুক
মেঘে ভিজে যাক
জমুক তুষারে
নগ্ন দেহ।

হে যুগ-দেবতা
কর অবসান
মানুষের গড়া রূঢ় সভ্যতা
সভ্যতা-গড়া
মানুষদেরে,
বন্ধ্যা পৃথিবী
চেয়ে আছে তারে সন্তান দাও
দাও পৃথিবীরে
মানব নব ॥

আমরা

আমাদের বিবর্ণ জীবনে
পৃথিবী এল না কোনোদিন।
তারে চিনি

ভূগোলের জটিল রেখায় ;
শুনেছি সে সূর্য-পিপাসায়
শূন্যে ভ্রাম্যমাণ :
আমার পায়ের নিচে যে কঠিন মাটি
তারও নাম হয়তো পৃথিবী
এই শুধু জানি।

অফুরন্ত সবুজ আভায়
পৃথিবীকে পেয়েছ তোমরা:
রক্তে তোমাদের
ফসলের পর্যাপ্ত নির্যাস—
অলস নিমীল চোখে
স্বপ্ন আনে জ্যোৎস্না-অন্ধকার—
তোমরা দেখেছ স্বপ্ন উর্বশীর আর ঈশ্বরের।
তোমরাই ভালোবাসিয়াছ
তোমাদের ভালোবাসা পুড়ে ফেলে ট্রয়
গড়ে তাজমহলের নীড়।

তোমবা করনি ক্ষমা:
বাহিরে এনেছ তুলে
পৃথিবীর মৃত দিনগুলি—
মূক-স্মৃতি-ভস্মে তার
এ-দিনের করেছ মুখর।
রাখেনি প্রচ্ছন্ন কিছু
কোনো যশ
এ-পৃথিবী তোমাদের কাছে—
তোমাদের যুগ তাই
তারি অস্থি-গত বজ্রে
ইন্দ্র সাজিয়েছে।

আমাদের স্বপ্নসাধগুলি
শুধু মাত্র ঋণ:
আমরা ইন্দ্রের সেনা অনুগমনের।
আমাদের বিবর্ণ জীবনে
পৃথিবী আসে না কোনদিন॥

উহ্য

তোমাদের তলোয়ার
ঝলমল করিয়াছে পৃথিবীর রোদে
ঝলমল করিয়াছে
তোমাদের মিনারের চূড়া।
তাদের অনেক ঘাম
অনেক চোখের জল
বহু রক্ত
শুকায়েছে পৃথিবীর রোদ—
তোমাদের ইতিহাসে
কোনো স্মৃতি আসে নাই তার,
শুধু এসে গেছে বারবার
মিনারের চূড়া আর
ঝলমল বাঁকা তলোয়ার।
স্বর্গে এল মহার্ঘ দেবতা
তোমাদের অপার্থিব লোভে
মর্ত্যে নামে দেবতারা
তোমাদেরি স্বার্থ-সাধনায়।
তাদের ক্ষুধিত দিন
ভঙ্গুর মাটির দেহ
অপমৃত্যু
দেবতার মন্ত্রে আরো ম্লান—
তোমাদের মন্দির-দুয়ারে
তার চিহ্ন নাই
অক্ষয় পাষাণে শুধু
করিয়াছ দেবতার ঠাঁই ॥

ফানুষ

আমরা ফানুষ:
আমাদের স্ফীত মন
ঊর্ধ্ব হতে
কৃপণ কৃপায়.

দীন ধরণীর দিকে চায়।
আমরা আকাশ করি পান
এই সূর্যাতীত সূর্যে
নীহারিকা-গাত্রে আর
অজ্ঞাত কল্পিত শূন্যে
আপন সন্ধান খুঁজে পাই
স্বপ্নম্লান মন করে
রক্তের উষ্ণতা অস্বীকার:
নারী তনুহীন আর
প্রেম হয় অশরীরী তার।
স্থান আর কালের সীমায়
আমাদের মূঢ় স্পর্ধা
চায় এক
স্পর্ধিত ঈশ্বর-
আত্মার বাসর-ঘর গড়ে।

আমরা ফানুষ:
ফিরে আসি আবার কখন—
সঙ্কুচিত দেহ-মন
পৃথিবীর
স্থির ধূলিতলে।
দেহের অণুতে শুনি
পৃথিবীর ধ্বনি:
প্রেমে অনুভব করি
দেহের স্বভাব।
আমাদের কণ্ঠে মেশে
ধূলি হতে ধূলিগত
মানুষের স্বর—
তাদের ক্ষুধিত মুখে
নাই স্পর্ধা
আত্মা নাই
নাই সে-ঈশ্বর॥

আজ

আজ যেন তারা এক হয়ে গেছে সব
দূর মেক্সিকো আর বাকু, ডিগবয়:
তেলের খনিতে আছে তেল আছে তারা
তাদের জীবন-দীপে শুধু নেই তেল।

কয়লার খাতে কালো হয় পরমায়ু:
নিউক্যাসেলের রঙে মেশে ট্রান্সভাল:
ডেভির জোনাকি জ্বলে আর চলে ছায়া—
তুলে আনে কালো রুটির মাত্র দাম।

বাস্কের মাটি রুরের মতোই রূঢ়
রূঢ় জার্মেনি, হিস্পানী ইস্পাত—
মাটি খুঁড়ে দেয় আপন মৃত্যু-বাণ
মাটির ছেলেরা ঘাতকের হাতে এনে!

চীনের সবুজ ক্ষেত এসে বাঙলায়
মিশেছে হয়তো কখন অলক্ষিতে—
মার্সাই আর বার্সিলোনার ঢেউ
ভিড়েছে কখন বোম্বের বন্দরে!

তারা এক, তবু চিনেনি একেরে আর:
আজ সূর্যের আলোতে কি নেবে চিনে?—
তাদের মৃত্যু আর যে মলিন আয়ু
একই রক্তের লাল স্রোতে আছে বাঁধা!

ইতিহাস

আমরা কি এসেছি কোনো পাহাড়ের চূড়ায়
সামনের পথ গেল মুছে—
আকাশের রঙ থেকে ফুটে উঠবেও বা একটি শৃঙ্গ
জানিনে।

সে-পথ আর নেই
অন্ধকারে দুর্গম আর অস্পষ্ট
পার হয়ে এসেছি সে অরণ্যময় পথ
যেখানে মানুষের গায়ে বাঘের নখের দাগ
সিংহের রক্তের গন্ধ!

তারপর দেখেছি সে দুঃসাহসিকের জনতা—
আহারের অন্বেষণে তারা খুঁড়ছে মাটি
পথের ধারে-ধারে তাদের কুটিরের বাসা :
আকাশের ভয় তাদের, দুর্যোগের আর রাত্রির ভয়
খোঁজে ঈশ্বরকে।

প্রাগূষায় ধূসর
চলেছিলাম আঁকা-বাঁকা পথে—
কুঁড়িতে বুঝি গন্ধ আসে তখন
নীল চন্দ্রের রাত্রি শেষ—
সৌধের অলিন্দে পুরুষ নারীর ক্লান্ত ভিড়
পান-পাত্রে শিথিল হয়েছে তাদের হাত,
জীবনের অপচয়ের অজস্র রেখা।

অবশেষে সূর্যোদয়—
প্রভাতের পথের ধুলায় উড়ল কি স্বর্ণরেণু
বিক্ষত পঙ্গপাল থেকে জাগ্‌ল কারা?
কী প্রদীপ্ত মানুষের শোভাযাত্রা এখানে—
ইন্দ্রের আকাশ গেছে ভেঙে
শুষ্ক বরুণের সমুদ্র
স্তূপীকৃত মানুষের স্মৃতি
পৃথিবীর বুকে।

মধ্যাহ্ন-মুখর এ-দিনের পথ—
তারপর কখন
এসেছে অপরাহ্নের বিষণ্ণ ছায়া
দেখেছি মৌন মানুষের দল
দেখেছি তাদের তীক্ষ্ণ উপবাস
তাদের নিশ্বাসে অনেকটা আকাশ কালো
দীর্ঘ পথে লোহার দাগ
তাদের রক্তে।

এ পথ কি ফুরোলো এ পাহাড়ের চূড়ায়—
সন্ধ্যার অন্ধকারে শেষ হল আমাদের যাত্রা?
ফুটবে না কি আরেকটি শৃঙ্গ
কোনো প্রত্যুষে?

আগন্তুক

পৃথিবীর রং মুছে ফেলে দেয় যারা
তারা তো আসেনি ফিরে
তাদের আত্মা করে অপেক্ষা ভবিষ্যতের ভ্রূণে
যায়নি পৃথিবী সময়ের সেই মহা-সমুদ্র-তীরে!

তাদের নামের অক্ষয় অক্ষর
মাটিতে রয়েছে লেখা
যাদের জন্য অরণ্য দূরে সরে করেছিল ঠাঁই
পৃথিবীতে ছিল যাদের দেবতা আর তরবারি-রেখা।

আবার যাদের তীক্ষ্ণ অশ্ব-ক্ষুরে
গোবির গেরুয়া ধূলি
ভূগোলের সীমা ভেঙে যাবে মিশে হিস্পানী উপকূলে
আসছে কি ভেসে মহা-সমুদ্রে তাদের স্বপ্নগুলি?

লেগেছিল কোন্ জাহাজে অজানা হাওয়া
দূর দিগন্ত হতে
মিশর মিশেছে 'মায়া'র মাটিতে নাইলের নীল ঢেউয়ে
সেই নাবিকেরা হারালো কি পথ দুঃসময়ের স্রোতে!

পৃথিবীর এই ভাঙন দেবে যে জোড়া
তারা তো আসেনি ফিরে
যায় নাই মুছে তাদের তৃষ্ণা দুরন্ত উৎসাহ
করে অপেক্ষা তারা সময়ের মহা-সমুদ্র-তীরে॥

নূতন আকাশ

ভেঙে গেছে অনেক আকাশ
এখন তো আকাশ নূতন ;
আমরা মরেছি বহুদিন
দীর্ঘ কোন্ পথের সীমায়।
ভাঙা আকাশের আলো ছায়া
দেহ ভরে নিয়েছি কখন,
আমরা যে গাছের মতন
আকাশ সরায়ে করি ঠাঁই।
ভুলিনি সে আকাশ এখনো
সেখানে হয়তো ফোটে ফুল,
এখনো তা রহস্য-রঙিন
মৃদু নীল স্বপ্ন-কুয়াশায়।
এসেছিল আমাদের রাত
ছিল দূরে সাদা ছায়াপথ,
আমরা পেয়েছি কার ঘ্রাণ
মনে কার মনের আস্বাদ।
বাঁচিনি আমরা তারপর
আসিনি এ পৃথিবীতে ফিরে
জানিনি যে রাতের মোহনা
পেয়েছে সে কোন্ সূর্যোদয়!
নূতন আকাশে কত ঢেউ
পৃথিবীতে কত রঙ স্মৃতি
এ আকাশ আমরা কি চিনি?
আমরা মরেছি বহুদিন।

যুদ্ধ

যুদ্ধের জন্ম হল
অন্ধকারে—
শস্যহীন প্রান্তরে—
ক্ষুধিতের আগ্নেয় জঠরে
মানুষের মাংস খসে যায়-

কঙ্কালে আবার জমে ওঠে মাটির ফসফেট
কোনোদিন সবুজ-পত্রে লেখা হবে সন্ধির স্বাক্ষর।

তখন তারা—
খসে-পড়া মাংসের বংশধর
শান্তির শ্মশানে
আহ্বান করবে যুদ্ধের প্রেতদের :
শান্তির স্তবে মৃত্যুহীন যুদ্ধ।

তবু একদিন থাকবে না যুদ্ধ
বন্ধ্যা পৃথিবীর উত্তাপ
—নাইট্রারে গ্লিসারিনে গন্ধকে লোহায়—
নিভে যাবে সন্তানের স্বপ্নে:
তখন আর মানুষের পৃথিবী নয়
পৃথিবীর মানুষ সবাই।

রিফিউজি

মুমূর্ষু মাটি ছেড়ে তারা আসে আদিগন্ত প্রান্তরে
মাটির স্নায়ুতে এল মৃত্যু—
অবশেষে গন্ধকের গন্ধে ;
ইস্পাতের ধারালো নখে ছিঁড়ে গেল আকাশ,
পুরোনো হলুদ রোদ মেরে গেল ছায়া হয়ে।
হয়তো কোনো নির্দয় গিরি-সঙ্কটের স্নেহ আজ–
হয়তো কোনো পার্বত্য প্রপাতের সৌহার্দ্য—
নেই যাদের যৌব রক্তের পিপাসা—
বৃদ্ধ মাটির মতো:
শিশু দিন এখানে পৃথিবীর—
দিনের অপর্যাপ্ত ভবিষ্যৎ।

পলাতক জীবনে—
বেঁচে তো আছে জীবনের কোনো ভগ্নাংশ—
মুখে যার আগুনের রং

পুরঃম্রিয়মাণ পায়ের চিহ্ন যার
গভীর হয়েছে পায়ে-পায়ে।

এ জীবনে কি তৈরি হবে না আকাশের ভ্রূণ?-
নতুন পৃথিবীর স্বপ্নরা যেন নেমে আসে—
কার্পেথিয়ান অরণ্যে,
ফিয়র্ডের সর্পিল শিরায়
ফরাসির উর্বর ক্ষেতে—
আর আসমুদ্র ইয়াংসি নদীর তীরে!

কুয়াশা

মুহূর্তগুলো মরে-যাওয়া আর বেঁচে-ওঠার ইতিহাস গাঁথে,
অশ্রান্ত পটক্ষেপ চলে মনের
মেঘের রঙের মতো।
তার চেয়ে কত বেশি কুয়াশা পাথরের স্তরের মতো
রয়ে গেছে নিচে!
আলোতে নয়
কুয়াশাতেই আমরা মানুষ,
এ-কুয়াশা সভ্যতার নীহারিকা।

কী হবে আলো আর আগুনে
প্রকৃতির নির্বোধ উচ্ছ্বাস যারা
মৃত্যুহীন যাদের পুনরাবৃত্তি।
সন্ধান তারা দেয় না তো কোনো নূতনতর বর্ণের
বন্ধ্যা আলো আগুন মানুষের নয় :

পাহাড়ের সিঁড়ি বেয়ে একদিন এসেছিল ভোর
আশ্চর্য পৃথিবী আর রাত্রিময় তক্ষশীলা তার
হয়তো মেলেছে চোখ ঘুম-ভাঙা পাখির মতন
এখনো ভোলেনি তারে আকাশের মেঘের পাথর।

দুরন্ত, তরুণ, দ্রব দাক্ষিণাত্যে বুঝি কোনোদিন।
আগ্নেয়গিরির মুখে লাল হয়ে উঠেছে আকাশ

এখনো সন্ধ্যার মেঘ আছে দীর্ঘ দিগন্তের গায়
পশ্চিমঘাটের পারে সোনা হয় সমুদ্রের জল।

কিন্তু সেদিনের দুর্জ্ঞেয় মনের ইঙ্গিত
আজ কোথায়!
দুস্তর-দূর-নেমে-আসা বন্য কুমারীর চোখ,
তক্ষশীলার তরুণীর কণ্ঠে অরণ্যের প্রতিধ্বনি,
অস্পষ্ট, অদ্ভুত হয়তো রুক্ষ আর রহস্যময়
নেই আর।

পার হয়ে এসেছে তারা নূতন আকাশের দুরন্ত বৃষ্টিধারা
মেঘদূতের মেঘ—উর্বশী-পুরূরবার জ্যোৎস্না রাত্রি,
জহর আর কামানের ঝলসানো আগুন তারপর
তলোয়ার, উল্কি আর সতীদাহ,
তুলসীমঞ্চে সন্ধ্যার ঠাণ্ডা প্রদীপ শিখা
মন হতে মনে নেমে এল।
এল শেষে আমাদের কুমারীর মনে শাড়ির ঝলমল
টেলিফোনে তাদের ধাতব কণ্ঠ।
এরা—
আর যাদের স্বপ্নের রঙে ম্যাডাম কুরীর রেডিয়াম
স্বপ্নের পাখায় এরোপ্লেনের প্রপেলারের তুফান
সেই সোচ্চার মেয়েরাও না
কত নিশ্বাসের কুয়াশায় ভরা।

কেতকী রায়ের চোখে জল :
চুলে আর মোটরের চাকায় যে হাওয়া
শাড়িতে যে প্যারিসের বিকেল ছড়ায়
সেই হাওয়া চেনে সে কেবল।
দখিনসাগর দ্বীপ এল বুঝি তবু
তার নীল নারিকেল-বনের হাওয়ারা
কেতকীর মনে ছলছল।

সামোয়ান-কুমারীর ঝরনা শরীর,
ঊর্মিল ঊরুর আর ভুরুর স্বপন
বন্ধুর করে সমতল।

ভালোবাসি কেতকীদের :
হয়তো তাদের চোখের ঠাণ্ডাকে, ঠোঁটের উত্তাপকে
শারীর রেখাময় শাড়িকেও হয়তো ভালোবাসি।
তবু সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা আছে সে কুয়াশার জন্যে
তাদের ঘিরে রাখে সে নির্মোক—
অজ্ঞাত সম্ভাবনার জন্মভূমি।

কোনো প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা নেই এর :
ভালোবাসি যাদের তাদেরই কি আমরা চিনেছি
কতটুকু ভালোবাসাকেও বা!
তাইতো এত আবেগ তার।
আবিষ্কার করতে পারিনি নিজেকে
তাইতো এত ভালো লাগে জীবন—
আর তাইতো জীবন অফুরন্ত ॥

সমাধি

লৌহিত্য-সিন্ধুর জল
আনল তিব্বতের ঢেউ।
মঙ্গোল ঘোড়-সওয়ারের চিৎকার।
এল মঙ্গোল রক্তের উজ্জ্বল জীবাণু।
করতোয়ার তীরে-তীরে
পুণ্ড্রবর্ধন আর সমতটের শরীরে।
তারপর কোথায় সেই পাহাড়ের, অরণ্যের গন্ধ!
ভেসে গেল সবুজ শস্যের হাওয়ায়,
মুছে গেল দ্রাবিড়ী ধানের স্বপ্নে।
আর আরাকানের দুরন্ত সমুদ্র-গন্ধ
চন্দ্রদ্বীপের নারকেল বনে হারালো।

গাঢ়, স্নিগ্ধ বিষের উৎসারে
তমালতালীবনরাজিনীলা—
ঝড-ভুলে-যাওয়া আবার সেই নীল আকাশ!
সহ্যাদ্রির দীর্ঘ, উদ্ধত ক্ষত্রিয়
কর্ণসুবর্ণের সোনালি মাঠে হারায় তার ঈগল-চক্ষু,
ডুবলো ভল্ল ভাগীরথীর জলে,

বল্লালী ভীরু রক্তে।
আর বখ্‌ত্‌ইয়ারের রক্তের তূকি-আগুন
নিভে আসে সিরাজের স্তিমিত কামানে।

নিবন্ত আগুন থেকে
নিয়ে এসেছি চোখে আমরা
সমাধির প্রদীপশিখা॥

বিরহ-মিলন কথা

আমরা অনেক দূর, আকাশের তারার মতন,
যদিও দাঁড়ায়ে আছি পৃথিবীর মাটির উপর
আছে আমাদের নদী, সমতল, পাহাড় ও বন
আছে মন, আছে কথা—তবু কেউ কারো কণ্ঠস্বর

শুনিনা যে। আমরাই আমাদের বিভীষিকা, ভয়।
চোখের সমুদ্রে আজ জোয়ারের হল কি সময়,
মরু পার হতে চায় ক্ষুধিতের দীর্ঘ ক্যারাভ্যান—
তাই ভয়—যদি ভেঙে দেয় আজ দূর ব্যবধান

সহজ রক্তের গূঢ় শব্দহীন গভীর প্লাবন!
আগুন লেগেছে বুঝি জীবনের বৃত্ত ঘিরে আজ,
আকাশের তূণ হতে তারাগুলি তীরের মতন
পিঙ্গল রাত্রির নিচে বিদ্ধ করে পাপবিদ্ধ মন ;

তারপর কোথা ঠাঁই? সম্মুখে যে সূর্য মেলে দল।
মরু-পথিকেরা দেখে সজীব, সজল সমতল,
জীবন অনেকদূর—কাছাকাছি, এক, অবিকল
আমাদের ক্ষুধা আর চোখের আতপ্ত লোনা জল॥

মৃত্যুর্ধাবতি

চাঁদে আছে এখনো কবিতা
আমাদের মসৃণ আকাশে :

একা এ আকাশ দেখি আজ!
তারার আড়ালে
নীল আর লাল আলো
খুঁজে ফেরে না তো কারো ঘুমহীন রাত!–
রাত নিয়ে আসে ঘুম
শরীরে-শরীরে
গাঢ় ভালোবাসার মতন:
এখনো এখানে একা
রাতের পুরোনো মন
জেগে রয়
নীল চোখে আর লাল ফুলে।

তবু আমাদের মাঠে
ফসলের শিষের হাওয়ায়
আসেনি কি নিবেদন
কোথাকার সুদূর ক্ষুধার?
অচেনা সমুদ্র হতে
পরিচিত কান্না নিয়ে
জাহাজ ডুবির ঢেউ
আমাদের উপকূলে
বালুতে লুটায়!
আমাদেরো দিনগুলো
ঝলসানো অদৃশ্য বারুদে,
অশরীরী সরীসৃপ
জীবনের 'পরে ফেলে মৃত্যুর নিশ্বাস।

মৃত্যুর আড়ালে ওঠে চাঁদ
সে আকাশে পাই কি না কবিতার স্বাদ!

অশেষ

জানি হব পার
বারবার
সময়ের মৃত্যু-নীল স্রোত
কখনো বা জয়—

সূর্যময় দিন আর শস্যময় মাঠ,
আমাদেরি জয়টিকা ভরে দেয় আকাশের আনত ললাট
আবার কখন
পরাজয় চিহ্ন এঁকে
দূর থেকে ফিরে আসে পাল-ছেঁড়া পোত—
দীর্ঘরাত্রি মুমূর্ষু জীবন।

তবু সেও চলা :
অশেষ এ অভিযান,
অদৃশ্য পার্বত্য পথ
সীমাহীন অদৃশ্য পর্বত
জীবনের রক্তে আনে গান।
অবিরাম
নির্ভুল যে কোন্ তীব্র নাম
জপে জীব-কোষ!
সেই নাম এনেছিল পৃথিবীর প্রথম প্রদোষ,
পৃথিবীর এই মাটি সেই নামে ময়ূরের মতন উতলা।
হাসি আর অশ্রুজল
মিলন বিরহ আর তৃপ্তি অসন্তোষ
তাই থেকে গেছে যে কেবল
পৃথিবীর দীর্ঘ দিনে,
তাই নিয়ে আমাদের কথা—ইতিহাস,
আমাদের বেঁচে থাকা তারি যে নিশ্বাস
তাই বুঝি নিজেরে চিনিনে!
শুধু জানি
দিয়ে যেতে হবে সব
মানুষের মাঝে পাওয়া পৃথিবীর সমস্ত বিভব—
আমার মানুষখানি
মানুষেরি ঋণে:
এ ঋণ তো ভোলে না পৃথিবী,
বহু-মৃত্যু পার হয়ে তাইতো আমরা চিরজীবী॥

প্রতীক্ষা

তোমাকে পেয়েছি, জানে পূর্ণিমার অনেক আকাশ
অনক ফুলের গন্ধ। তবু যেন ছিল অবকাশ,
তবু থেকে গেছে দূরে কত কথা, পৃথিবী কঠিন—
তোমাতে আমাতে যারা নিবিড় হয়নি কোনদিন।

তোমাকে পাইনি কাছে মধ্যাহ্নের সূর্যের আকাশে—
প্রখর মাটির রুক্ষ আদিগন্ত দীর্ণ দীর্ঘশ্বাসে—
যে মাটিরে দিতে হবে সবুজের অগাধ আশ্বাস
ফসলের কিশলয়ে জীবনের স্বচ্ছ প্রতিভাস।

স্বেদজল আছে জানি, স্বেদসিক্ত নয় তো ললাট,
মাটির অক্ষরে দেহ করে নাই সৃষ্টি-মন্ত্র পাঠ
দিবারাত্র উন্নিদ্র প্রান্তরে। আছে আয়ত নয়ন
নেই তাতে পৃথিবীর নির্বাক মনের প্রতিস্বন।
চেয়ে থাকি কবে কোন্ মুহূর্তের মানচিত্রে আঁকা
আমাদের সেই দিন, মন হতে যুগল বলাকা
উড়ে যাবে অফুরন্ত আকাশ-আশায়, পারে নীড়
সীমান্ত-বিহীন মাটি—দুটি দেহ যেখানে নিবিড়॥

রাত্রি

মহানগরীর চকিত আকাশ হতে
এলো এ-রাত্রি নেমে:
যদি ফিরে আসে কোনো এক শতদলে
আলোর ভ্রমরগুলি—
কুয়াশায় তাই পৃথিবীর নিশ্বাস!

মহানগরীর গণিকা রাত্রি নয়
বণিকের জতুগৃহে—
আগুনের শিখা যার প্রজাপতি-দেহ
পুড়ে দেয় বারবার—
বারবার তার ভস্মে পৃথিবী ম্লান!

মহানগরীর অন্ধকারের গুহা
গুঞ্জনে ঝিলিমিল—
অন্ধকারে ভ্রূণেরা সহসা মেলে
লক্ষ-লক্ষ পাখা—
কোনো দিগন্তে শোনো পৃথিবীর হাসি?

মহানগরীতে এল যে রাত্রি নেমে
চোখে প্রতীক্ষা তার—
খেলে আগুনের সর্পিল তরবারি
কবে শেষ হোরি খেলা—
লেখা হয় নাম আরক্ত পৃথিবীর!

পরিবেশ

প্রাচীন এ দৃশ্যপট :
প্রত্যহ সমুদ্র-শব্দে জাগে সমতট,
অরণ্যে সবুজ দিন আসে,
রাত্রিরা তারায় তীব্র আদিম আকাশে।
কোনো এক প্রাগৈতিহাসিক
ভাদ্রের পদ্মায় আজো দেখে গেল রৌদ্রের ঝিলিক—
দিগন্তে মেঘের ছবি অদ্ভুত রেখায় আজো আছে—
কালো-নীলে রাঙা পাখি উড়ে যায়
এক বুনো গাছ থেকে আর এক গাছে—
এক মুঠো ধান
দেয় ম্লান অঘ্রানের হাওয়ায় অপরিমেয় ঘ্রাণ।

এই দৃশ্যে আমরা নূতন—
আমরা নূতন অভিনেতা :
আমাদের সুপ্তি-জাগরণ
যেন অন্য কোনো দিনে,
আমাদের হাসি-অশ্রু-ব্যথা
শুধু নিতে পারে চিনে
অন্য কোনো সময়ের আকাশ-বাতাস।
এই নদী এই জল
সমতলে অলস ফসল
দূর হতে করে শুধু রূঢ় পরিহাস।

আমরা সমুদ্র চাই
যে সমুদ্র নয় এই সুন্দরবনের,
বন্দরের আলো আর
জাহাজের ইস্পাতী ছায়ায়
সে-সমুদ্র করে ঝলমল।
আমরা এসেছি নিয়ে মনে এক ধোঁয়াটে আকাশ
সেখানের পাখির পাখায়
ছবি নেই—এলুমিনিয়াম।
আমাদের ক্ষেত হতে মুছে গেছে বলদের চোখে
কোনো বিষণ্ণ দুপুর
সেখানে লোহার দাঁত—
গভীর লোহার দাগ—
গ্রাম ছেড়ে একদিন শেষে
পৃথিবীর দিকপ্রান্তে মেশে॥

অসাময়িক

তোমার শরীর হতে ছায়া ঝরে পড়ে
আমার স্তিমিত মনে।

আমাদের সময়ের অস্থির উত্তাপ
কত আকাশেরে পুড়ে যায়,
ভস্ম হয় ইতিহাস,
জীবনের পরমাণু করে অগ্নিস্নান।
আমরা এ-সময়েরি শিশু,
তবু কোথা অতন্দ্র আগুন,
আমাদের চেতনায় নেই তার পিঙ্গল স্পন্দন
নেই ক্ষুব্ধ স্নায়ুর আক্ষেপ,
ছিঁড়ে ফেলে আকাশের নীল পটভূমি—
খুঁড়ে ফেলে পৃথিবীর প্রাচীন কবর
আমরা পারিনি দিতে
আমাদের সময়েরে কোনো উপহার।

সজল তোমার চোখ,
রুদ্ধ কণ্ঠে বলি, 'ভালোবাসি'—
সেই চোখ, সেই কথা প্রেতের মতন
আমাদের রক্তে করে খেলা॥

আসন্ন

সে-পৃথিবী কতদূর
আমরা শুনেছি যার কথা?
পথিকেরা পার হয় সময়ের তীক্ষ্ণ মরু-পথ—
পেছনে তাদের কারো পড়ে আছে শব,
মন হতে কেউ বুঝি হারায়েছে সুর
তপ্ত বালু নিয়ে শুধু যাদের মদির কলরব,
তবু বহু পথিকের রথ
এল আজ সময়ের উর্ধ্ব সীমায়,
এখানে সজল আকুলতা
মেঘের মতন এক পৃথিবীর ছায়া দেখা যায়।

সেই পৃথিবীকে বুঝি দিতে পারি পেশী হতে মানুষের শ্রম,
মন হতে স্বপ্ন সীমাহীন,
নিতে পারি যতটুকু চাই।
সেখানে সীমার পরাজয়:
আপন সীমারে শুধু করে যাওয়া মুহূর্তে-মুহূর্তে অতিক্রম,
শুধে যাওয়া ইতিহাসে মানুষের ঋণ ;
সমুদ্র সীমান্ত নয়,
সেখানে মাটির সীমা বিষুবরেখায় লেখা নাই।

সে-পৃথিবী কাছে এল, মনের অনেক সন্নিকট,
যবনিকা অন্তরালে শোনা যায় তার কণ্ঠস্বর,
উঠবে এখনি বুঝি পট
এই দৃশ্যে শেষ হোক ঝড়॥

তারপর

এখন আকাশ হতে
মৃত্যুবীজ আসে
জীবনের দীর্ঘ কোলাহলে।
নদী হতে মুছে গেল গান—
অন্ধকার স্রোত হয়ে চলে,
সমতলে নেই ধান—
এলোমেলো সেখানে কবর।

তবু এর নেই কিছু মানে:
শুধুই হাওয়ায়
এসে ভেসে যায় ঝড়,
তারপর
পাখি বাঁধে নীড়।
আকাশ আবারো হবে নীল,
দূরে উড়ে যাবে চিল—
ছায়া তার মিশে যাবে
মাটির সবুজ ঘন ছায়াতে কোথায়!

পৃথিবীর স্বপ্ন আছে,
তার মৃত্যু নাই,
জীবনের পরমাণু বেঁচে থাকে তাই॥

আগুন

পুবের আকাশে ধোঁয়া:
আমাদের চোখ স্বপ্নময়—
আমাদের আষাঢ়স্য প্রথম দিবস:
এখনো আগুন জ্বলে পশ্চিম আকাশে

আগুনের মৃত্যু নেই—
তারার আশ্বাস নিয়ে কখনো সে জ্বলে
সমুদ্রের বাতি-ঘরে,
কামারের অশ্রান্ত হাপরে,
অণুবীক্ষণের তলে,
শহরের সহস্র আঁখিতে—
মৃত্যুরে ঠেকায় প্রাণপণ।
আবার কখন
সভ্যতার শিরা ছিঁড়ে যায়
অনর্গল রক্তের মতন
দিগ্‌বিদিকে ছুটে চলে আগুনের স্রাব—
প্রাণপণে মৃত্যু এনে দেয়।

তবু এ আগুন :
মানুষের মনের আগুন,
মেধার আগুন,
তারপর পেশীর আগুন।
আমাদের আগুন কোথায়?—
আমরা মাটির পোকা
উড়বার নেই যেন পাখা—
নবধারা জলে করি স্নান,
অন্ধকার করি পান ;
জীবনের ভয় দিয়ে
আর পরাজয় দিয়ে
শুধু ঢেকে রাখা!

এ আকাশে আগুনের ছায়া ঝিলমিল—
মাটির জঠরে তবু
জমে যায় পোকার ফসিল ॥

নামহীন

অতি দীর্ঘ সময়ের কোনো এক মুহূর্তের মুমূর্ষু রেখায়
পদচিহ্ন থেকে যায়
কোটি জনমানবের।

তারো আগে ঢের
সূর্যের আর পৃথিবীতে মানুষেরা সৃষ্টি করে গেছে
সময়ের অজস্র প্লাবন,
তার থেকে বেছে-বেছে
গুটি কয় ক্ষণ
আমরা গড়েছি ইতিহাস—
জানি শুধু তাই নিয়ে মানুষের মাটি ও আকাশ!
যাদের গিয়েছি ভুলে
নামহীন যারা এই সময়ের কূলে—
তারাও করেছে পান বহু জ্যোৎস্না, বহু রৌদ্রছায়া,
তাদেরো আয়ুকে ঘিরে ছিল জেগে মেয়েদের মায়া,
অনেক শিশুর মুখ,

'ভঙ্গুর মাটির ভাণ্ডে গুপ্ত আছে যে অমৃত-বারি'
ছিল তারা তাতেও উৎসুক।

আজ মনে হয় তারা ছিল মরুচারী
তাদের পায়ের চিহ্ন মুছে গেছে বালুর তুফানে,
মুছে গেছে তারা দূর দিগন্তের পানে
ঝিলমিল রৌদ্রের শিখায়।

যারা আজো স্বাক্ষর বিকায়
সময়ের হাত হতে অন্য কোনো সময়ের হাতে—
তুমি আমি কতখানি তাদের ক্ষণের
তাদের মনের?—
থেকে যাই কতটুকু তাদের আশায়?
আমরা এনেছি নাম
অগণিত নামহীন হাত—
আমরা আলগ্ন তাই সময়ের ক্ষীণ ম্লান স্রোতে :
এই স্রোত ভোলে ভবিষ্যৎ,
সম্মুখের পথ
আঁকেনি দূরের চিহ্ন, রাখেনি প্রণাম।

আমরা এখনো আছি—অন্ধকার নেপথ্যের ভিড়,
পৃথিবীরই খড়কুটা দিয়ে গড়া আমাদের নীড়,
অনেক-অনেক রাত্রি শ্রাবণে নিবিড় হয়ে আসে,
আমাদেরও আছে বহু সুরভিত ভোরের আশ্বিন,
কার্তিকের দীর্ঘশ্বাসে
অবসন্ন আচ্ছন্ন বিকাল,
আছে ফাল্গুনের দিন
সন্ধ্যা দিয়ে রমণীয় লাল।
আমরা আগুন জ্বেলে দেখি তবু কতদূর পথ দেখা যায়,
আঁকা থাকে আমাদের ফসলের দাগ কোনো পাহাড়ের গায়,
আমরা কুড়ায়ে এনে রেখে গেছি অনেক ইস্পাত
আমরা গুনেছি দিন,
জেগে থেকে গেছি কত রাত,
আমাদেরও ছিল মন ছিল মেধা ছিল আলোচনা,
জেনে নিয়ে সময়ের কোথায় মোহনা
অনেক খনিতে শেষে দিয়ে গেছি মানুষের কঙ্কালের ঋণ।

দূরাসন্ন ইতিহাসে আসে যারা সূর্যের মতন
গেলাম তাদেরে দিয়ে কিছু স্বপ্ন. তবু কিছু মন ॥

নতুন দিন

পৃথিবীর সেই সব দিন
সেই সব জন্মের উল্লাস
এখনো স্মরণ করি:
কুমারী মাটির চোখে সেই এক প্রথম বিস্ময়—
প্রথম শিশুর নাম
বলে গেল একদিন স্বপ্নের আকাশ,
ধানের মঞ্জরী দিয়ে লিখে গেল হেমন্তের স্মরণীয় কোনো সূর্যোদয়।

সে আশ্চর্য লোহিত জীবনে
ঝরে পড়ে সময়ের ধুলো,
দিগন্ত ধূসর হয় সময়ের শবে।
হে আকাশ, স্বপ্ন চাই
চাই এক নূতন বিস্ময়—
নূতন এ কুমারী কামনা
মাটির গহন অবয়বে।
খনির ভ্রূণের শিশু
অন্য এক সূর্যে মেলে চোখ,
আকাশ আবার ঝিলমিল,
ঢেউ তোলে ঢেউ ভাঙে সময়ের সজীব সলিল

ম্লান হয়ে এল সেই পৃথিবীর ঘ্রাণ,
সময়ের শিথিল শরীর
মৃত্যুর বুদ্বুদে ক্ষত,
মরা গান
বিস্মৃত আকাশ
মাটির স্থবির চোখে আজ।
এ চোখ আবারো হবে কুমারীর চোখের আকাশ,
স্বপ্নের পাখির ঝাঁক
সে-আকাশে উড়ে যাবে সহস্র পাখায়।
পৃথিবীর সেই জন্মদিনে

রেখে যাই আমার বিস্ময় ;
আমার চোখের আলো.
মনের খানিক পরিচয় ॥

ডাক

শুনি ডাক।
হেমন্তের গভীর বিকাল
ছায়ার পাখির মতো ওড়ে ঝাঁকে-ঝাঁক,
দিগন্তের লাল
নিথর ছায়ার গাছ টেনে নেয় বুকে,
ছায়ার ছোঁয়ায়
মাটি-ছোঁয়া আকাশেরে হঠাৎ আকাশ বলে যেন চেনা যায়।

তারা ডাকে—
এ ডাকের ঢেউরা কি ছায়া?
তেমনি নিবিড় হয়ে থাকে
সেই ডাক হেমন্তের সকল বিকালে—
যত মাঠে হেঁটে গেল তারা—
আমাদের ঘিরে আছে হেমন্তের যতগুলো মাঠ।
সেই ডাক ভেসে যায় পদ্মার গেরুয়া পালে-পালে,
শালবনে করাতের কাঠ
গুঁড়ো-গুঁড়ো সেই ডাকে ঝরে-ঝরে পড়ে।

ডাকে তারা:
বিদ্যুতের সজাগ পাহারা
পার হয়ে সেই ডাক কত রাত্রি আনে!
যে রাত্রির মানে
দিনের মৃত্যুর মতো জানি:
ঝকঝকে লোহার আগুন,
খনির জোনাকিগুলো,
নীল ইস্পাতের যাঁতা
সে রাত্রিতে করে কানাকানি।
তারা ঘন হয়ে আসে সেই ডাকে মানুষের সহজ ভাষায়,
বারে-বারে আমাদের ছুঁয়ে গেল যারা যেন তাদের হঠাৎ চেনা যায়।

যুদ্ধোত্তর

মেরুর বরফ-দিন আবার ওখানে ফিরে আসে,
ওদের পৃথিবী ভেঙে যায়,
মুছে দিয়ে যায় ধু-ধু সাদায় আকাশ—
ওদের তাসের দেশ বরফের কঠিন কফিন।
কফিন মোমের সারে ঘেরা—
পথ খোঁজে কফিনের সাদা মানুষেরা,
কথা কয়, কানাকানি করে:
'এবার ফুরোলো বুঝি পৃথিবীর দিন।'

ফুরোয় কি পৃথিবীর দিন?
সূর্য আছে, দেহতটে আছে তাই নূতন জোয়ার,
আবার অরণ্য-দিন নিয়ে আসে জীবনের উজ্জ্বল উল্লাস!
সূর্য আছে, আছে মাটি, ফিরে আসে আকাশ ও চাঁদ,
নূতন মানুষ আসে—শোনা যায় মানুষের নূতন নিনাদ!

সূর্য থাকে কালো-কালো ত্বকের আড়ালে,
নাইল আর তাইগ্রিস, গঙ্গা-ইয়াংসির তীরে-তীরে
আবার সূর্যের আশীর্বাদ।
কালো মানুষের ভিড় সমুদ্রের ঢেউয়ের চূড়ায়।
কালো মানুষের ভিড়
ক্যারাভানে, লাঙলের ভেজা মেটে পথে—
এবার এদেব দিন, দিন ভরা এদের শপথে॥

কৃষক

অনেক দূরের থেকে তোমাদের জানি।
বুজে আসা নদীর মতন
পুরোনো খানিক রক্ত, খানিক পুরোনো ফিকে মন
হৃদ্‌পিণ্ডে করে কানাকানি ;
মাঝে মাঝে তাই
মাটির একটু ছোঁওয়া, আকাশের একটু নিশ্বাস
সমস্ত হৃদয়ে খুঁজে পাই!
তোমরা যে-চোখ নিয়ে মাটিতে তাকাও

যেই ভালোবাসা নিয়ে আকাশকে পাও
আমাদের সে-চোখ কোথায়!
কোথায় কোথায় যেন আছে তবু কিছু কিছু মিল—
চোখ যেন ভোলে নাই সবুজ মমতা,
ভোলে নাই আকাশের নীল।
ভুলেছি কি তোমাদেরো, ভাই,
পুরোনো খানিক রক্ত সে কি নয় আমাদেরই খানিক হৃদয়?
দূরেব কুয়াশা ভেঙে সে-হৃদয় খুঁজে নেয় অনেক পুরোনো পরিচয়।
পুরোনো খানিক রক্তে তখন জোয়ার!
পুরোনো খানিক রক্তে সমুদ্রের স্বাদ—
পুরোনো খানিক রক্ত বুজে-আসা নদী নয় আর॥

শ্রমিক

তোমার অনেক পরিচয়
আমাদের পৃথিবীতে আজ।
সময়ের ইতিহাস বারবার সুরভি-মদির,
ফুলের মতন তুমি ঝরে ঝরে ফুটেছ আবার—
পউষের মাটি হয়ে পৃথিবীর হাতে বারবার
দিয়েছ ফাল্গুন উপহার।
আকীর্ণ তোমার হাড়ে সময়ের সমুদ্রের তীর—
স্তূপাকার শুভ্র স্মৃতি সমুদ্রের পাখির মতন।

তোমার অশ্রান্ত হাত
ধূসর অতীত ভেঙে যেতে যেতে হয়েছে অলাত-
তাই আজ তোমার আভায়
পৃথিবীর সূর্য-দিন, পরিচ্ছন্ন মন
ভবিষ্যৎ বলে চেনা যায়॥

১৯৪২-এর পর

অন্ধকারে আমাদের প্রবেশ-প্রস্থান।
অন্ধকার থেকে তবু কেউ কেউ দেখে গেছে আলো।

আশ্চর্য, সে-সব ম্লান মানুষেরও রক্তে সেই মৃদু উপাদান-
নরম মাটিতে বোনা ভারতীয় ধান.
যেই রক্ত চেনে শুধু মেরে গেলে চিতার আগুন
চেনে না কামান
সেই মানুষের মনে একদিন এসেছিল মৃত্যুর শপথ—
আলোর নূতন ভগীরথ
দেখেছিল কামানের ভীরু আস্ফালন—
রক্তে মেখেছিল ক্রুদ্ধ বারুদের মদির আঘ্রাণ।

রক্তের ফোঁটায় সেই অন্ধকার—রাত্রির আকাশ।
তারার আকাশ আজ আমাদের গাঢ় অন্ধকার।
অমেয় আলোর ছায়াপথ
দূর থেকে কাছে সরে আসে।
এখন উজ্জ্বল দৃশ্য—অন্ধকারে আর নয় প্রবেশ-প্রস্থান।
"হে হিরণ্যগর্ভ, খোল মুখ—"
ম্লান মানুষের পায়ে আলোর অশান্ত অভিযান—
মৃদু ম্লান মানুষের হৃদয় উৎসুক॥

২৬শে জানুয়ারি

একটু সময় দিয়ো, হৃদয়ের খানিক সময়
তাদের সে-ছায়ার উপর—
ছায়া হয়ে গেছে যারা তোমাদের ছায়া দেবে বলে।
তোমাদের ছিল ঘর,
নাবিকের দল তারা ভেসে গেছে কত দূর সমুদ্রের জলে—
হয়তো আসেনি ফিরে,
তাদের মায়ের চোখ, তাদের প্রিয়ার চোখ কত রাত্রিদিন
জেগেছিল চিহ্নহীন, স্মৃতিহীন সমুদ্রের তীরে ;
তাদের মায়ের চোখ, তাদের প্রিয়ার চোখ
আরেক সমুদ্র রেখে মুছে গেছে গাঢ় অন্ধকারে!
তোমার প্রাঙ্গনে, দ্বারে
জীবনের, মরণের সেই অন্ধকার
হৃদ্‌পিণ্ড ছিঁড়ে নিতে আসেনি কখনো, কোনোবার।
তোমার রোদের গায়ে মাখা ছিল ছায়া
মায়ের চোখের মতো,

প্রিয়ার চোখের মতো রোমাঞ্চিত মায়া,
ছিল রোদ ঘুম-ভাঙা—রোদের নরম কিশলয়!

একটু সময় দিয়ো মন থেকে—যদি মন লয়—
তাদের এ ক্লান্তির উপর—
ধূলিতে ধূসর যারা মরুযাত্রী ফিরে এল ঘরে।
তোমারে করেছে প্রদক্ষিণ
বারবার আশ্বিনের ফাল্গুনের সুরভিত দিন ;
তাদের দিগন্তহীন, নিদ্রাহীন রাত্রির শিয়রে
ছিল মরু-ঝড়।
আকাশে হারিয়ে গেছে তোমাদের স্বপ্নের বলাকা-
নারীর নয়ন হতে রহস্যের শিহরণ মাখা।
নিয়েছ অনেক অনুভব ;
তখন তাদের চোখ পুড়ে গেছে রোদের শিখায়
রক্তের লিখায়
ধূসর মরুর ইতিহাসে
রেখে গেছে নামহীন নাম।
তাদের ছিল না কিছু—যা ছিল তা সব—
অকরুণ আগ্নেয় আকাশে
উজ্জ্বল-সূর্যেরে-দেওয়া গভীর প্রণাম॥

ইতিহাস-দেবতা

তোমায় চিনি, ইতিহাস-দেবতা,
মনের বিধাতা, চিনি তোমায়—
জানিনে আব দেবতারা কোথায়।
জানি তোমার নাভিনালে ফুটে উঠেছিল অতীতের শতদল,
ফুটে উঠবে ভবিষ্যতেরও পদ্মরাগ।
তোমার মালাগাঁথার শেষ নেই,
শেষ নেই ফুলের মতো জীবনের—জীবনের মতো ফুলের শেষ নেই।
ফুল—যার সুরভিত স্বপ্নে এসেছে আমার বসন্ত—
আমার বৈশাখ, আমার আষাঢ় রূপায়িত যার রূপরেখায়।
যে মাটি ফুল ফোটায় আমার রক্তে তারি হাতছানি—
পঙ্কমাতার পঙ্কজ আমি মহাকালের মালায়॥

যৌবনোত্তর

রাত্রিকে কোনোদিন মনে হত সমুদ্রের মতো ;
আজ সেই রাত্রি নেই।
হয়তো এখনো কারো হৃদয়ের কাছে আছে সে-রাত্রির মানে
আমার সে-মন নেই
যে-মন সমুদ্র হতে জানে।

একবার ঝরে গেলে মন
সেই ঝরাফুল আর কুড়োবার নেই অবসর ;
তখন প্রখর সূর্য জীবনের মুখের উপর—
তখন রাত্রির ছায়া জীবনের স্নায়ুর উপর—
জীবন তখন শুধু পৃথিবীর আহ্নিক জীবন।

মহাগণিকা

অনেক মানুষ এল
অনেক-অনেক দিন হতে,
ভালোবেসে গেল তারা
হে পৃথিবী,
ভালোবেসে গেল তোমাকেই।
তারা কি তোমার মনে আছে ?—
হে মহাগণিকা,
তাদের হৃদয় আজ তোমার হৃদয়ে বেঁচে নেই।

আমরা এসেছি আজ নূতন মানুষ
তোমার পুরোনো প্রেমে :
ভোরের গোলাপ হয়ে ফুটে ওঠে তোমার আকাশ,
অপরাজিতার নীল মুঠোমুঠো ছড়ায় দুপুর,
গোধূলির জবা ফোটে—
অনেকদিনের মতো এখনো ফুরোয় এক দিন।
এখনো তেমনি রাত্রি,
অন্ধকার ছিঁড়ে-ছিঁড়ে কোথাকার আলো যেন উঁকি দেয় অজস্র তারার,
এখনো তেমনি আছে জ্যোৎস্নার মসলিন।

তোমার বনের হাওয়া ভিজে-ভিজে সবুজ-মতন,
আকাশের নিচে-নিচে পাহাড়ের ধূসর প্রলেপ.
সমুদ্রের ঝিলিমিলি যোজনা-যোজন—
তেমনি তো আছে সব,
অনেক-অনেক আগে মানুষেরা পেয়েছে যেমন!

এই সব সন্ধ্যা-রাত্রি-প্রভাত-দুপুর
ভালোবেসে রেখে গেছে তারা,
পাহাড়-সমুদ্র-বন স্বপ্ন দিয়ে মেখে গেছে তারা,
তারপর ছায়া হয়ে মিশে গেছে সময়ের পুরোনো ছায়ায়।
তাদের স্মৃতিব শীত
তোমার হৃদয়ে লেগে নেই,
তোমার হৃদয়ে আজ
হে মহাগণিকা,
ঝলমল সন্ধ্যা-রাত্রি-প্রভাত-দুপুর—
তোমার উত্তাপ আজ আমাদের জীবনের গায়!

মহামৃত্যু

তোমার কাহিনী যেন ছিল এক নীলাভ বিস্ময়
হৃদয়ের,
কথা তার ছিল না কখনো,
ছিল না আকাশ, রাত্রি, দিন।
কথা দিয়ে তার পরিচয়
দিতে চাই।
কোনো এক চকিত আকাশ,
কোনো রাত্রি, মর্মরিত দিন
নিয়ে আসে খানিক বিস্ময়.
খানিক সময়
মনে হয় নীলাভ মসৃণ,
শুধু মনে হয়,
মনের কিনারে তারা আসে আর যায়—
মনের মহিমা কেউ নয়!

তোমার কাহিনী ছিল হৃদয়ের খানিক সময়
সে-সময় ভেঙে গিয়ে নীল,

নেই তার আকাশের, দিনের, রাত্রির, গাঢ় ভাষা ;
আমি নেই.
নেই তুমি তোমার চোখের ঝিলিমিল।
ছিল শুধু আমাদের হৃদয়ের খানিক বিস্ময়
হয়তো মৃত্যুর মতো—
মহামৃত্যু তোমার আমার,
তোমার একার মৃত্যু নয়॥

অতীত

যখন জীবনে
একদিন কোনো এক জীবন অতীত হয়ে গেছে—
(সমুদ্রের থেকে দূরে চলে এসে শুনি তবু সমুদ্রের স্বর)
সে-জীবন আমারি এ জীবনের মনের ভিতর
কোথায় কখন যেন করে যায় মৃত্যু কোলাহল!

সময়ের অক্লান্ত নিয়ম
হয়তো অতীত করে দিতে চায় কোনো এক অতীত জীবন,
কার্তিকের রোদের ফসল
শীতের মাঠের মনে যেমন অতীত ;
শীতের মাঠের মনে সময়ের নিয়মের শীত।

বৈশাখের, আষাঢ়ের, আশ্বিনের আকাশের স্তূপ
সময়ের স্তূপ কেটে মাঠের মাটির জীবাণুরা
আবার হেমন্ত আনে।
আমার হৃদয়ে নেই জলবায়ু আকাশের অনেক অতীত,—
মেঘের অনেক চূড়া—
অনেক হেমন্ত নিয়ে সময়ের অবিশ্রান্ত রূপ।

আমার হৃদয়ে আসে একবার একটি আষাঢ়
মেঘ নিয়ে চলে যায় শুধু একবার,
ধ্বনি তার থেকে যায়
জীবনেষ কোনো এক নিভৃত গুহায়।
একবার আসে নীল আকাশে আশ্বিন
জীবনের কোনো এক প্রান্ত ছুঁয়ে যায় নীল দিন,
তারপর শুধু তার আভা।

সে-আভা আলোর মতো হঠাৎ কখন
হৃদয় কুড়িয়ে পায়,
জীবনের উষ্ণতার মতো তারে পায় বুঝি মন।

অনুভব

হৃদয়ের অনুভবগুলো
একদিন স্মৃতি হয়ে যায় :
আকাশে খানিক আর খানিক হাওয়ায়,
কোনো এক পথের কিনারে,
হঠাৎ বিকেলে জানালায়
ছবির মতন যেন কিছু আঁকা থাকে ;
ছবি আছে—রেখা নয়,
ঘোলাটে দূরের রঙে রেখাগুলো মুছে গেছে বলে মনে হয়।
ছবি হয়ে স্মৃতি হয়ে যায়
বিষণ্ণ মেয়ের মতো চোখ তুলে একটু তাকায়
অনুভবগুলো।

নেই আর তাতে গাঢ় হৃদয়ের রঙ :
অনুভবগুলো
হারায়ে ফেলেছে নীড় গভীর হৃদয় হতে এসে বহুদূর,
আকাশের রঙে তার রঙ যেন হয়েছে পাণ্ডুর,
বিকেলের রোদে আর গাছের ছায়ায়
তারে ছুঁয়ে যায়
প্রকৃতির আরেক নিয়ম।

অনুভবগুলো!
কোনোদিন ছিল এরা রক্তের সৈকতে—
শরীরের অশরীরী গান!
সময় খচিত ছিল কারুকার্যে হয়েছিল জীবনের আশ্চর্য নির্মাণ ;
জীবনের হাত থেকে আজ এরা প্রকৃতির হাতে—
ভোরের আলোতে আর সন্ধ্যার ছায়াতে!
হৃদয়ের সকল ক্ষমতা
একে-একে প্রকৃতির হাতে দিতে হয়—
হয়তো এ সময়ের অন্য কোনো কারুকার্য—মৃত্যুর বিস্ময়।

বিস্ময়

জীবনের কোনো এক দিকে তবু রোদ লেগে থাকে :
ভালো-লাগা কোনো এক আকাশের রোদ,
নীল-হয়ে-যাওয়া রোদ জ্যোৎস্নার ভিতর,
কখনো কোথাও কোনো মেয়ের চোখে যে রোদ ছিল।

সময়ের অন্ধকার হাতে,
এই এক অনাত্মীয় সময়ের কঙ্কাল গুহাতে—
স্তূপে-স্তূপে অন্ধকার-জীবনেরে তুলে ফেলে দেয় নাই কেউ।
জীবনের এক দিক ছিল—
ছবির মতন এক দিক
দীঘির মতন এক দিক
রোদ আলো রঙ নিয়ে হৃদয়ের কাছে ঝিক্‌মিক।

জীবনের অনেক পাতায়
হৃদয়ের কাছে আর আমাদের ছিল না সম্ভ্রম :
আমাদেরি হৃদয় সে—তবু যেন আমাদের নয়!
হৃদয়েরে গণিকার মতো শুধু ব্যবহার করে গেছে কামুক সময়—
চলে গেছে ফেলে দিয়ে পথের কিনারে
ভুলে থাকা যায় বলে অকাতরে ভুলে গেছে তারে।
কাছে থেকে, পাশে থেকে হৃদয়ের রোদন শুনেছি।

তবু সেই হৃদয়েও রোদ এসেছিল—
কেবল রোদন নয়,
জীবনের কী এক বিস্ময়।

রাত্রিশেষের কাব্য

এখন যে-কোনদিন দেখা যাবে প্রভাতের প্রপাত আকাশে,
আকাশে জলের মতো আলো
মাটিতে আলোর মতো জল!
এ-দিন অনেক দূরে ছিল
যখন ছিলাম আমি প্রভাতের মতন উজ্জ্বল।

প্রভাতের দিকে তবু পথের ইশারা—
অন্ধকারে মুখ মেজে অন্ধকার হয়ে তবু প্রভাতের দিকে যেতে হয়
তাই যেন হঠাৎ হৃদয়
খুঁজে পায় পেছনের পথে যারে ফেলে এসেছিল হিরণ্ময়।

সে আজ ধূসর প্রেত, ধূসর মগজে শুধু ঘোরাফেরা করে ;
ঘোরাফেরা করে যেন কোথাও আলোর আশা আছে—
সে-আলো কি পাওয়া যাবে প্রভাতের প্রপাতের কাছে?

হৃদয়

যেতে পারো জীবনের খানিক গভীরে ;
(বালিয়াড়ি পার হলে আছে এক জলের ইশারা।)
কোলাহল থেকে ফিরে
যেতে পারো হৃদয়ের কাছে।
সেখানে তাদের ভিড়
কোলাহলে আসে নাই যারা :
আছে কথা আরেক রকম
ছবি আছে জীবনের ব্যবহৃত পুরোনো ছবির ব্যতিক্রম
আকাশের অন্য কোনো মানে,
সময়ের অন্য কোনো স্রোত
শোনা যায় হয়তো সেখানে।
সেই সব কথা, ছবি, আকাশ, সময়
একদিন কবে যেন হারিয়ে ফেলেছি,
দাঁড়িয়েছি জীবনের রৌদ্রের ভিতর ;
রৌদ্র আছে, আছে ঝিলিমিলি
তবু মনে হয়
ছিল যেন জীবনের অতলে কোথায়
কত কত ছায়া!
সে ছায়ার কথা, ছবি, আকাশ, সময়
কোলাহল থেকে ফিরে
হৃদয়ের কাছে দেখা যায়॥

ছিন্ন

আমাদের ছিল যতটুকু বা আকাশ
আজ তা স্মরণ চিহ্ন—
ভোরের চাঁদের মতো
রজনীগন্ধার মতো—সুরভির খানিক নিশ্বাস।
ছিল পথ যতখানি
আমাদের হৃদয়ের মতন নির্জন—
যে-পথ ফুরিয়ে গেলে
ছায়ার হাতের ছোঁওয়া
ঘন করে দিয়ে যেত আমাদের মন—
সে-পথ কোথায় গেল কোলাহল করে করে দূরে?—
পাখির ডাকের মতো—
ক্লান্ত ডাক ফিকে হয়ে মিশে যায় যখন দুপুরে।

যেটুকু সময়
এসেছিল একদিন তোমার আমার উপকূলে
আর সে সমুদ্র নয়—
ঢেউ নেই আর,
ঢেউগুলি হয়তো বা বালু-বেলা ধু-ধু সাদা ছবি—
শুধু দিক-দিগন্তের, দিনান্তের, মনহীন দীন অন্ধকার!

করুণ পথের রেখা
নিথর সময়
হৃদয়ের কিনারে দাঁড়ায়।
পরাজিত হৃদয় হারায়
যেন এক স্বর্গ-পারিজাত।
কোন পরী-উর্বসীর স্মৃতিতমোময়
নিয়ে এর হৃদয় একা
নিয়ে শর্বরী স্মৃতি
শবরীর ইশারায় সারি-সারি হাত।

পুনশ্চ

তোমার ছায়ায়
পুরোনো অনেক রোদ পাখির মতন উড়ে যায়,
পুরোনো অনেক মেঘ নিয়ে আসে অগাধ আকাশ
হয়তো দাঁড়ায় এসে কাছে ঘেঁষে নীল-নীল বন।
আবার আমার মন
খানিক আলস্য চায়, মনের খানিক অবকাশ।

এ-আকাশ ভেঙে গেছে কত
কত রোদ মুছে গেছে—উড়ে গেছে মেঘ,
হৃদয়ের ক্ষত
মুঠোমুঠো অন্ধকার ফেলে গেছে জীবনের আলোর উপর-
মুঠোমুঠো মৃত্যু ঢেলে গেছে।
ধূসর স্মৃতির ছায়া হৃদয়েরে ধূসর করেছে ;
ছায়া-ছায়া সময় তখন,
হৃদয়ের নীড় ছেড়ে রোদের পাখিরা যাযাবর,
ছায়া-ছায়া আকাশের রঙ,
ছায়া-ছায়া মন।

ছায়া ছিল, শুধু ছায়া, জানিনি তোমার ছায়া আছে
পুরোনো ছায়ার কাছে
যে ছায়া তারার মতো আলো।
সে-আলোয় ছায়ারা হারালো,
হারালো হৃদয়
আবার নূতন করে দিতে সে পুরোনো পরিচয়।
আবার জীবন এল, ছিল তার আরেক আকাশ
সেখানে পাখিরা আসে রোদের মতন,
চোখে ঝিলমিল করে নীল-নীল বন—
পাখা মেলে দিতে চায় মনের পুরোনো ইতিহাস॥

সবুজ মেয়ে

সবুজ মেয়েরা আসে বারেবারে এখনো আষাঢ়ে
সবুজ মেয়েরা দলে-দলে।

সবুজ ফুলের রঙ গালে
কচি চুল সবুজের ছায়া
সবুজ মেয়েরা আসে
আলিসায়, জানালায়, আরো যে কোথায়!
কোথায়—কোথায় আসে?
জুঁইফুলে?
কাঁচা রোদে?
মাঠভরা ঘাসে?

একটি সবুজ মেয়ে ভেঙে গেছে কাচের মতন
হয়তো কখন!
সবুজ আলোর কাচ মিশে গেছে আষাঢ়ের রোদে-
তারপর সেই আলো এখন অনেক—
অনেক সবুজ মুখ জানালায়, আলিসায়, মাঠে,
আকাশে তাকায় একা, একা-একা হাঁটে॥

ধ্বনি

ধ্বনি ছিল। ধ্বনি আছে।
তবু কি ছিল কথার ধ্বনি
তোমার আর আমার?
তোমার মনে আমার ব্যাকুলতা
তোমার স্তব্ধতা—আমার মনে—ছিল কি?
কোথাও কি ছিল এমন-কথা?

কোনো আকাশে—আকাশের ওপারে
অণুতে—বিদ্যুতাণুতে—অণুর বিদ্যুতে
ধ্বনি ছিল,
শ্রুতির ওপারে কথার প্রতিশ্রুতি .

অপরূপ কারণ-কণিকায়
নীহারিকার নীরব গুঞ্জন।
তারার দ্বীপপুঞ্জে
বিস্রস্ত সূর্যের হুংকার!
সূর্যের আকাশে ধ্বনি—প্রতিধ্বনি!

পৃথিবীর আকাশে স্বর-প্রস্বর—রব-কলরব!
তবু কথা নয়
তোমার আমার কথা নয়
শীতল উত্তাপ নয় এমন
শিল্প নয়—এমন তপ্ত শীত নয়।
কত বিদ্যুতের জন্ম আর মৃত্যু
কত অণুর জীবন:
জন্ম জীবন মৃত্যুর ধ্বনি আমাদের মন।
মৃত্যুর শীত, জীবনের উত্তাপ, জন্মের স্বাদ
স্থানের চূর্ণ কালের বর্ণ কালের বন্যা
তোমার মন—আমার মন
তোমার আমার কথা।

কথা হারিয়ে যায়। হারায়—রাত্রিতে—জ্যোৎস্নায়—অন্ধকারে
ভোরের অবাক আকাশে
নদীর বিকেলে।
মন থেকে হারায় কথা—জীবন থেকে—কথা থেকে জীবন।
হারিয়ে যায়—হারায়
ব্যাকুল স্তব্ধতা—স্তব্ধ ব্যাকুলতা।
কথা নেই
নেই তুমি—নেই আমি।
আকাশ থেকে আকাশে
আবার ধ্বনি।

আকাশের শেষে আকাশে
আকাশের ধ্বনি—সময়ের ধ্বনি।
সময়ের ওপারে
অপরূপ কারণ-কণিকায় ·
অণুর ধ্বনি।
ধ্বনিহীন ধ্বনি আবার ॥

সন্ধ্যা

গন্ধ ওঠে—নদীর গন্ধ, মাছের গন্ধ
মাটির গন্ধ

সন্ধ্যা !
গন্ধ আসে—আকাশের আর অন্ধকারের
তারার—নীহারিকার—শিহরিত শূন্যতার
ছন্দের গন্ধ
সন্ধ্যা !
ছায়ার গন্ধ শহরে—সড়কে
সমুদ্রের গন্ধ পাহাড়ের ছায়ায়
সমুদ্রে সময়ের গন্ধ
সন্ধ্যা।

সন্ধ্যা !
মনের গন্ধ তোমার আমার,
গভীর হয় নিবিড় হয়,
গন্ধ হয় গন্ধ !
তুমি-আমি অন্ধকার—সন্ধ্যা।
তুমি-আমি নদীর গন্ধ—সন্ধ্যা !
তুমি-আমি তারায়-গভীর আকাশ,
সময়-গভীর সমুদ্র,
সময়ের গন্ধ, সমুদ্রের গন্ধ, গন্ধের গন্ধ !
দিন নেই, রাত্রি নেই
তুমি-আমি
সন্ধ্যা।

অপ্রেম ও প্রেম

১

একদিন সব ভুলে যাই।
কিছুই থাকে না আর তোমার আমার
কোনো কথা, কোনো মন, সময়, আকাশ,
শিহরিত সিঁড়ি দিয়ে হৃদয়ের পাতালে নামার
কোনো চিহ্ন, ইতিহাস—
কিছুই না।
মনে তো পড়ে না আর তুমি ছিলে কিনা
তুমি, কোনো মেয়ে, কোনো মেয়ের মতন
অন্ধকার—অন্ধকার স্বাতি-বিশাখার !

থেমে যায় সময়ের স্রোত ;
যেন কিছু হতে চায়—হতে থাকে নিটোল, নিবিড়
মেঘ হয়, মেঘের কপোত—
আকাশের বুক জোড়া পাখি!
ভোরের দূরের নীলে
তাকে নিয়ে আকাশ নরম
নরম মেয়ের মতো—
কোনো মেয়ে কোনো পৃথিবীর।
কোনো মেয়ে—তা-ই মনে রাখি।
শুধু তা-ই! আর তখনো তো
ভুলে যাই একদিন তুমি কেউ ছিলে।

২

মনে থাকবে না!
এই আলো, এ বিকেল, এই বেচা-কেনা,
এই কাজ—প্রেম, রাঙা জীবনের দেনা
এ নিবিড় পৃথিবীর, নিজেদের হঠাৎ এ চেনা
মনে থাকবে না।

তবু কিছু থাকবে কোথাও,
এই আলো এই ছায়া যখন উধাও
বিকেলের উপকূলে বিকেলের শ্বাস ফেলে চুপচাপ ঝাউ
আলো-লাগা, ভালো-লাগা মন— নেই তা-ও
তখনো হয়তো কিছু থাকবে কোথাও।

তখনো থাকবে ছবি তোমার-আমার।
দেখবে, পারো না একা হৃদয়ে তাকাতে তুমি আর,
যতবার
তাকাবে দেখবে কেউ আছে তাকাবার ;
অপলক চোখ যেন কার
তোমার চোখের পাশে—হয়তো আমার।

৩

আমার আকাশ নেই   তবু তারে পেতে দাও
দাও এক কণা
সোনালি সন্ধ্যায় আজ   একবার বল শুধু
বল : ‘ভুলব না’।

তারপর ভুলে যেয়ো   তুলে নিয়ো দুই চোখে
নীরব তিমির—
তারপর মুছে যাক   এই কথা, এই আলো
এই পৃথিবীর।
তবু চোখে রাখো চোখ   ছল হোক আঁকো ছবি
জলরঙ দিয়ে—
খানিক আকাশ গড়ি   ক্ষণিকের আলো-ছোঁওয়া
কথা-দেওয়া নিয়ে ৷৷

৪

আমাদের সেই নীল উজ্জ্বল বিকেল
নেই আর—জানি, মেয়ে, জানি,
সেই ক্ষণ সেই মন করে যায় তবু কানাকানি,
মনে পড়ে সে মায়াবী পথ—
হাওয়া-মেশা হাওয়ার জগৎ,
হাওয়ার নেশায় দোলা ঝাউ-নারিকেল।

সে বিকেলে ছিল ভালোবাসা
তুমি জানো আমি জানি ছিল দুটি থরথর মন,
'ভালোবাসি'—তবু কেউ বলিনি তখন
ভুলে গেছি পৃথিবীর ভাষা।

ভুলে গেছি সেই ভুলে তুমি নেই, নেই আর আমি
সেই পথ, সে-বিকেল আমাদের জীবনে বেনামি ৷৷

৫

নিতে পারো কতটুকু তুমি
দিতে পারো কতটুকু আর
পারো দিতে হৃদয়ের রাঙা অন্ধকার?
জানি আমি এ তোমার মনের মৌসুমি—
একটু চোখের ছায়া একটু বা হাতে হাত রাখা।
তোমার এ মৌমাছির পাখা
কেন বল আমার এ ঝড়ের আকাশে?

আমার আলোর ঝড় ছুড়ে দেয় মুঠোমুঠো তারা
আমার পাতাল—তার চারদিকে রাত্রির পাহারা
এখানে পৃথিবী নেই পৃথিবী ফুলে আর ঘাসে।

এ আগুন নিতে পারো নিতে পারো এই অন্ধকার?
পারো যদি নিয়ে যাও যা-কিছু আমার ॥

৬

তোমার এমন মন কোথায় হারাল?
হারাল হীরার রাত, সোনার সকাল,
বিকেলের ঝিলিমিলি আলো!
সে-মন কি মনে আর পড়ে না এখন—
চৈত্রের আগুনে লাল
ঝলমল মন?
হায় সব হল অবসান
বুকে পেয়ে হেমন্তের ঘ্রাণ!

আমি তো ভুলিনি সেই কবেকার মন,
কত ঝড় এল যে আকাশে
তবু তো আকাশ দেখে শুনে যাই গুনে হৃদয়ের মৃদু বিধুনন—
এ-হৃদয় ভালোবাসা তবু ভালোবাসে।

আমার ফসল নেই—এই যদি বল অপরাধ—
আমার হৃদয় আছে, আছে মন, জেনো তবু আছে চৈত্র-চাঁদ ॥

৭

বৈশাখের আষাঢ়ের আশ্বিনের আলো-ছায়া-গান
মায়াবী মমতা আর অঘ্রানের ঘ্রাণ
মুছে গেলে থাকে শুধু পৌষের কুয়াশা ;
এ-কুয়াশা প্রেত
চোখে তার মরণের অমল সংকেত
মনে তার অন্য এক আকাশের ভাষা।

আমরা পৌষের অভিসারী
নেই আর উষার আগুন,
আকাশে তুষার-ভোর—
রাত্রির নিরাভ আবরণ।
তবু কেন মন
পঞ্চ শরে ভরে নেয় তূণ—
হায়, তবু কেন চোখ চৈত্রের চকোর!
তুমি এক অপরাহ্নে বিষণ্ণ রোদের কান্না, নারী!

৮

আসবে কি আকাশ আবার
আসবে কি যেন আর নয় হারাবার
আশ্বিনের নীল দিন, মহাশ্বেতা মেঘ?
অন্ধকার ছিঁড়ে-ছিঁড়ে নক্ষত্রের আগ্নেয় আবেগ
এনে দেবে রাত্রি বহ্নিমান?

পৃথিবীর রাঙামন আবার কি করবে নির্মাণ
পঞ্চশর, পঞ্চদশী চাঁদ
রিক্ত রক্তে সমুদ্রেব স্বাদ?
ফিরে কি আসবে কি কপিশ কামনা?

পৌষের তুষার-কণা
বিন্দু-বিন্দু মৃত্যু নিয়ে আসে
ধুলোর পৃথিবীময়, ধূসর আকাশে।
ফিরে আসবে না
শরতের সূর্য-রথ, বসন্তের সেনা ;
মৃত সময়ের হিম
তোমারো হৃদয়ে আজ, হে সূর্যপ্রতিম।

৯

তুমি আশাবরী।
আমি চাই বনছায়া আর তুমি রোদ—
রাজপথে রোদের জ্যামিতি।
চায়না পাখির বোধ
পৃথিবীর অন্ধকার প্রীতি
অঢেল আকাশে চায় নীল মিহি জরি।

রোদ, শুধু রোদ—সে কি হয়?
একদিন মেঘ আসে—বল আসে না কি?
তোমারি এ পাখির হৃদয়
ছায়া নিয়ে সেদিন একাকী ;
সব চলা ক্লান্ত হয়, সব জ্বলা নিভে-নিভে আসে-
তখন আমার আশা উজ্জ্বল আকাশে।

১০

সব দিয়ে গেল।
প্রীতির পৃথিবী ঢেলে রেখে গেলে হৃদয়ে আমার
আকাশের অবকাশ রেখে গেলে মেখে নিতে চোখে।
সকালের মদালস মন
তারার আগুন-ঝরা রাত্রির প্লাবন
তোমার এ-উপহার
পারিনি এখনো ফেলে দিতে।
এখনো হয়তো কোনো বসন্ত-বিকেলে
হৃদয়ের শীতে
পেতে চাই তোমার আলো-কে
যেতে চাই তোমার ছায়ায়
হৃদয়ের জ্বরে।
তুমি নেই—নেই—আর সবই থেকে যায়
মনের, প্রাণের খেলাঘরে।

১১

আমার সময়
কখনো ফুলের গন্ধ কখনো বা গান
কখনো সোনার সূর্যোদয়।
হয়তো জানো না তুমি, তোমার এ দান।

তুমি সেই পৃথিবীর মন
যে-মন সুরভি হয় ফুলে ;
তুমি সেই আকুল আকাশ
অকূল, অবাক, ধ্বনি, নীলিমিত-সমুদ্র-রমণ ;
নিমীলিত তিমিরের আবরণ খুলে
আগুনের কারুকলা তুমি—
যে-আগুনে জ্বলে মরুভূমি
যার অনুরাগে জাগে ঘাস।

আমি জানি, আমার নির্মাণ
তোমার সুরভিময়—তোমারি এ দান ;
তোমার একটি কথা, অপলক চোখ
আমার আকাশ আর আমার আলোক ॥

১২

হৃদয় আকাশ হয়ে আছে।
কোনো এক মৃত নাম নীলিমায় নীল
মেঘের আখর নেই, নীল অনাবিল।
কোনো এক মৃত মন সাদা ছায়াপথ
দূরের তারার ফুল— বাসি ফুল— মনের শপথ।
কোনো মৃত হৃদয়ের স্বাদ
ভোরের আলোয় জলে মুছে যাওয়া চাঁদ।

হৃদয় আকাশ হয়ে আছে
কোনো এক মৃত প্রেম ভুলে যাই পাছে ॥

১৩

সব আজ খালি।
দিলাম ফিরিয়ে সব। সব আলো সোনালি-রুপালি
তোমার দিনের হাতে। সব তাপ তারার আগুনে।
কথার কত না মিহি মোলায়েম মসলিন বুনে
জড়ায়ে দিয়েছি মন মৌনতার রাঙা উত্তরীয়ে
তোমার আকাশে তার ধ্বনি শুধু নীরবতা নিয়ে
হয়ে থাক নীল।
প্রাণের নিখিল
হয়তো ছিলে না তুমি। গন্ধ তাই দিয়ে যাই ফুলে
ছোঁওয়া মৃত্তিকার কায়ে। তাই নাও চির হৈমবতী।
আকাশে ও জলে মুছে যাক ব্যর্থ আমার আরতি
পদচিহ্ন মুছে যাক অন্ধকার সময়ের কূলে ॥

অবিচ্ছিন্ন

অনেক বছর পরে যদি দেখা হত
যখন আরেক মেয়ে তুমি,
তোমার চোখের থেকে যত কালো-আলো ঝরে গেছে
আবার নিবিড় হত তারা,
অনেক দূরের রাত দূরের ঢেউয়ের মতো এসে মিশে যেত
এই চুলে–

করাত কালোর স্নান—
সময়ের সব গাঢ় ঘ্রাণ
আমাদের চারদিকে,
আবার মনের এই চুপ-করে-থাকা
কথা ভুলে যাওয়া,
আবার আকাশ ভরা হাওয়া,
আবার আবার এই সব।

খুঁজে পেত পৃথিবীর পুরোনো বিভব
হয়তো হৃদয় আর হৃদয়ের বিদায়ী জীবন :
সেই সব নীল নদী ছায়া-ভেজা বন
সাগরের নাটে নটরাজ আকাশের কলরব
অপরিচিতার মৃদু সুরভির মতো,
অনেক বছর পরে আবার তোমারি সাথে যদি দেখা হত।

জন্মদিনে

সূর্যের সোনার নীড়
আলোর পাখিরা ফিরে যায়।
রাত্রি আসে।

রাত্রি এসে আমারে শুধায়:
"কী দিয়েছ পৃথিবীরে?"
কী দিয়েছি! দিইনি কিছুই।
বরং নিয়েছি তুমি যা রেখেছ পাশে—
সন্ধ্যার রজনীগন্ধা, ভুঁইচাপা, জুঁই।

নক্ষত্রের আগুনের নীলে
তেমনি জিজ্ঞাসা :
"আকাশে কি দিলে?"
দিইনি। গিয়েছি ভুলে
হৃদয়ের ছিল কোনো ভাষা—
মালা-গাঁথা হবে কোন্ ফুলে!

পারমিতিহাস

এ বন-লাবণ্য কেন বল অন্যমনে যদি রাখবেই মুখ ঢেকে ময়না
থাকলই যদি চোখে নীল অপলক চাওয়া তবে আর যাযাবর
বলাকার পালকের ভার কেন সয় না
সমুদ্র চাই?—দিতে তাম্র-তমসা তাই ভাস্বতী হতে চাও ইলা
ইন্দ্রানী হতে চাও তুমি শর্বরী মেয়ে উর্বশী-সাধ নেই কেন এই
শবরীর লীলা
রক্তের রাঙা পালে জানো না কি শীলবতী হৃদয়ের লালে কারে
খুঁজছ
উজ্জয়িনী নয় সোনা-মোড়া পাহাড়ের সূর্য
সেখানেও চেরিকুল সেখানেও মেঘনাদ সেখানেও চেরিফুল গুচ্ছ।

ভর্তৃহরি নই আমি হরিকালদেব বাঙলার পাখি হরিয়াল
জানি দূরে উড়ে যেতে আকাশের শেষ দেশে বৃত্রের বৃত্ত
বিশাল ॥
আমি কি পারিনে হতে অর্জুন
পেতে পারি লিচ্ছবী পরি-হোরি মণিমালা চিত্রাঙ্গদা নারী
চৈত্রের হোরা নিয়ে হোরি খেলা বিশাখা-আগুন ॥
লৌহিত্যের মতো রক্তের উপবীতে আমিও তো হতে পারি
ব্রহ্ম-সুহ্ম
মাটির কামনা-মাখা কামাখ্যা মেয়ে দেবযানী উচাটন হবে
কচ উন্মন ॥
কাজ নেই সমুদ্র-কাচে আর মুখ-দেখা দিব্যতা থাক-থাক
ঊর্মিল অঙ্ক
গংগীত ভংগীতে সংগীত দেব আমি মৃত্তিকা-সুরধুনী আনব
কপিলের নর্তকী প্রকৃতির পঙ্ক
মর্ত্যের অনুভবে স্বর্গের সুর-ধ্বনি জানব
মগদের দেবপাল নালন্দা নিয়ে থাক বাঁকানাল আমি রণবঙ্ক ॥
করতোয়া-কপোতীর অহল্যা-বক্ষে
কল্লোল-উল্লাসে মল্লিকা-বেলা ফোটে শতকোটি-লক্ষে,
অলক্ষ্যে পাশে বসে পাশা খেলে তিস্তা
সে-ও তো মহাশ্বেতা বিস্তৃতা মুক্তা-হার গাঁথে স্বাতী হয়ে
নয়তো অনীস্থা ॥
আমি যবভূমিরাজ বিরাজ আমার আজ যা আছে হৃদযে
নয় সবটুকু বিষ তা।

আমি যম 'কোপনী কম্রতা আননে' এস কাননের পাখি
কৃষ্ণপক্ষে
মৃগনাভিগন্ধে মন্দ্রিতছন্দে অলক্তচন্দনে এ-অলকা
ওঙ্কারধাম কর রক্ষে
এস যজমানী মেয়ে মানবের হিমালয়ে এস যমী
এ-হীরক কুণ্ডে
যোষিতা প্রোষিতা নও প্রসীদ হে মহাদেবী এ-নাটের
অভাজন শ্রীভরত-তুণ্ডে
চঞ্চলা লক্ষ্মী, ঐরাবৎ-ইরা অবিরল দেবে জল শুণ্ডে॥

এ-বন-লাবণ্য কেন বল অন্যমনে যদি রাখবেই মুখ
ঢেকে কন্যা
প্রচুর-পয়সী-প্রাচী কেন হতে এলে তবে কেন ছিল চোখে
প্রেমবন্যা
কেনইবা প্রচেতায় এত ভয় রাগে নয় অভাগিনী শুধু
অনুরাগিনী-সুধন্বা॥
বৈদেহী হতে চাও তাই হও মানময়ী আমিও তো হতে পারি রাম
ছায়া হয়ে উড়ে যাও রাধা হয়ে পুড়ে যাও আমি শ্যাম
নয়নাভিরাম
স্কন্ধে হল নিয়ে বলরাম বেশে ফিরি পুলকিত দেশে-দেশে বেশ
ধানসিড়ি নদী আর সুবর্ণসিঁড়ি কোথা আনন্দে স্কন্দের পায় অশ্লেষ॥
শ্রীমন্তরায় আমি দক্ষিণগামী শনি কন্দর্পের নাশে প্রবল নাবিক
এলোমেলো উড়ে চুল আমি চাই জবাফুল সাবিত্রী হও প্রিয়া
প্রবাল-নাভিক ॥
আমার বাসুকীবিষ দিব্যের দীঘি-জলে পরশুরামের হাতে
অশোকের লালে
জানি নিতে পদাঘাত পদ্মিনী হও মেয়ে আসুক তেমন রং
কপোলে-কপালে
কোথা সেই শক্তি কোথায় বা আছে তার লাঞ্ছন স্বস্তির চিহ্ন
তুমি আজ ভাগবতী ছিন্ন॥

আমি জামদগ্ন্য বঙ্গের মল্ল ছিলাম প্রফুল্ল কমলের দলে শ্বেতহস্তী
যুগে-যুগে পুড়ে ছাই তবু যুগে-যুগে পাই উদীচীর দধিচীর অস্থি ॥
আমার শশাঙ্ক আর কামলঙ্কা, জানি, কবি বাহ্লিক-বাল্মীকি
পাবে না কখনো
'অখনতনে'র চোখ বিমর্ষ 'হর্ষে' অবনত অবশেষে হিমালয়ে
চিরতনু কিরাতিনী-লগ্ন

আমারি তো চন্দ্রপীড় আদিত্য কাশ্মীরে উহ্লারে কহ্লনে উল্লাস-সুর
তারা যদি মুছে যায় ছিঁড়ে যায় তারাহার তবু তার বাজবে নূপুর ॥
পূর্বসুরীরাই অস্ত যায় আগে উত্তরধ্যানী অগস্ত্য শূর
রম্যালয় থাকে পম্পানীড় রাখে অগ্নিশিলাময় পৃথ্বিপুর
মণিপুর মুখ ঢাকে পেয়ে মোহমুগ্ধাকে বহুদূরে সরে থাকে বোরোবুদুর ॥

থাকে অনিরুদ্ধ দীপঙ্করের শোভা শ্বেতাশ্ব-কলি-প্রিয়া রুক্মিণীর।
রবে নীর নীরবের চিরকাল মধুজ্বালা লবঙ্গ-এলাচি-দারুচিনির
অক্ষিবাণে হবে পক্ষীরা বিদ্ধ বৃক্ষের ফল কর যত না দান
কাচ্ছকন্যা দিদ্দা থাকবে কার্থেজে ডিডো-পাখি বহ্নিমান ॥
চাও না মৃত্যুর রাত্রির কলেবর সৈকত চুম্বনসিক্ত
ইন্দ্রজাল চাও, কত বড় শূন্যতা জানো না তো সে যে কত রিক্ত ॥
জানকীর মতো মেয়ে আলো চাও, আলো কই, জোনাকির চিতা
নভোনীল পারিজাত অপরাজিতার আলো কোথায়
কোথায় আছে, সীতা!
পৃথিবী চাওনা চাও আকাশ-সলিল
স-লীলা মেদিনী থেকে প্রদোষারা নয় অনাবিল!
যোগিনী বালিকা কেন বন ছেড়ে চাও তপোবন
কেন চাও রুপোলি জীবন?
এস ফুলে এস রূপে বলিযূপে মধুপের শঙ্খিনী দাও হলাহল—
কেন এত ভালোবাসো কালো পাখি মোহহীন মন
হও কল-হংসিনী নাও এ-মৃণাল
আমার তামসী জায়া করেছ আমারে ভস্ম ভাস্বতী
তুমি চিরকাল ॥
আমার পাষাণ বুক বারবার ভেঙে যায় বারবার ফিরে আসে পাঁকে
মোহনদরজা আমি শাশ্বত পঙ্কজ দ্বারে-দ্বারে নাম লেখা থাকে।
আমার তামার মাটি কোল দেয় দেয় রাজ-অঙ্ক
হাতে দেয় সমুদ্রশঙ্খ
আমি রণবঙ্কমল্লদেব হই ভীত চাঁদসূর্য মেঘে মুখ ঢাকে
কমলাক্ষ আঁকে ওঁ আমার প্রথম নাম আমার প্রথম মন
অন্ধকার শুধু মনে রাখে ॥

পুরোনো পরিচয়

ভুলিনি সবুজ দিন—ভুলিনি নরম সেই আলো,
আছে মনে পরিচ্ছন্ন প্রভাতের কথা:

একটি একাকী মেঘ কোথায় হারায়
একটি রুপালি পাখি রোদে উড়ে যায়
একটি দূরের গাছ আকাশের গা-ঘেঁষে দাঁড়ায়—
মনে আছে ছবিগুলো—মনে আছে লেগেছিল ভালো।

সবুজ এখনো হয় দিন ;
একটি মেঘের ছবি ভেঙে-ভেঙে কত ছবি হয়
রাত্রি থেকে উঠে এসে গাছগুলো চেয়ে দেখে দিনের বিস্ময়
জানি সবই হয়
সবই আছে জানি—-তবু পৃথিবী কঠিন।

পৃথিবীর রূঢ় আলো মুছে দেয় সব পরিচয়,
সব ছায়া মুছে ফেলে রৌদ্রে এসে দাঁড়ায় হৃদয় !
শিশু-নারী-নীড় ঘিরে একটু আহ্লাদ,
জীবনের ভাঙাচোরা সাধ,
খানিক মধুর ক্ষণ—সময়ের মৃদু কলনাদ
নেই আর, সামান্য এ স্বপ্নগুলো তা-ও নেই আর।
আকুলতা নেই শুধু পড়ে আছে পৃথিবীর হাড়,
কঠিন পৃথিবী, শুধু কঠিন পৃথিবী জেগে রয় !

ক্ষমা কোরো
ক্ষমা কোরো যদি ভুলে যাই—
ভুলে থাকি পরিচ্ছন্ন প্রভাতের কথা ;
কখন প্রভাত এল ভুলে গিয়ে যদি বা তাকাই
রূঢ় পৃথিবীর দিকে—-ক্ষমা কোরো ভাই।
আকাশের ছবি আছে—সুন্দর আকাশ
সবুজ পৃথিবী আছে—আকাশের, মেঘের, পাখির।
সেই পৃথিবীতে বুঝি নেই আর আমাদের হৃদয়ের নীড়,
ক্ষমা কোরো, নীড়হারা কঠিন হৃদয়
না-ই যদি পারে দিতে নিজের পুরোনো পরিচয়॥

বিভাবরী

তোমার চোখে দু-ফোঁটা রাত এত গভীর
এত বিভোর?
নেই যে আর ভোর-দুপুর নেই বিকেল—

তোমার রাত দু-ফোঁটা রাত নিরুদ্বেল—
এমন স্থির!

দু-চোখ ভরা দু-ফোঁটা রাত এমনো হয়!
কী অদ্ভুত!
দু-জনই যেন দু-ফোঁটা রাত—রাতের কেউ
দু-জনই যেন অন্ধকার—রাতের ঢেউ
আকাশময়।

তোমার চোখে দু-ফোঁটা রাত ক্ষণিক রাত—
অনেক রাত
অতীত আর ভবিষ্যৎ উধাও তার,
মায়ের মতো তারার রাতে আকাশ-পার
বাড়ায় হাত!

তোমার চোখে দু-ফোঁটা রাত রাতের ঝড়
কালান্তিক!
দু-জন যেন যোজন-ভরা ঝড়ের মন,
দু-জন যেন করেছি কবে মৃত্যুপণ
পরস্পর ॥

আশ্বিনে

নব-ভাস্বর-নভো-ভাস্কর রশ্মিত-স্মিত আশ্বিন!
আকাশে ও ঘাসে শিশিরের শিহরনে,
ভালোবাসা-মাখা মনে।
ভালো-লাগা কত দুর্লভ দিন
কত না কামনা ফিরে আসে ফের
হৃদয়ে, বাঁচাতে শুধু নিজেদের,
চোখেরে চাওয়াতে সমুদ্র-লীন
নীল ঢেউ নীলাকাশে।
আমার চাওয়া তো তাদের আর্ত চাওয়া
আত্ম-ছায়ার আভাস দেখতে পাওয়া :
দেখি, শিলাভাসে চির নীলে আর আলেয়া-অনলে অন্তঃশীল স্মরণে।
সব জানা ছিল তার।
কত অশ্বিনী-তারার শুভ্র রমণীয় রেণু হয়ে গেল ছারখার

বেলা-সেঁউতির ঢেউ এল বারবার
হৃদয়-বেলায়, কত বেলা হল, কত বালু এল কটাহের সাহারায়
সুরশৃঙ্গার জানত সে-কথা, অজানা সেতার কাঁদত সে ব্যথা বিনিয়ে।
মৃত্যুর থেকে খানিক মৃত্যু ছিনিয়ে
সান্ত্বনা পেত মন।
আজ সব সমাপন।
আশ্বিন আসে সেই সুরধুনী-ফল্গুর কথা মনে করাবার খর খুর-ধ্বনি নিয়ে।
মনোরথ সাধে অজিন-অশ্ব-হ্রেষা।
তমোলোকগণনীয়ে,
তামসীর লিপি আমার আখরে গুনেছ কি মন নিয়ে?
সোনা হয়ে গেল তামা,
আমার যা কিছু তা আমার আজ আর তুমি হলে বামা!
তবু প্রিয়তমা মনে থেকে যায় তোমার অমিয় নাম,
অণিমায় মিশে মিতালি পাতায় চুপে-চুপে অবিরাম।
তাই এলোকেশে পুলক আমার আমি পূষা-পুলমায়ি
সুরাসুর মাতরিশ্বা, যা বল, চির নভো-কোল-শায়ী।
বুকে আশ্লেষ নিয়ে তাই আজ চোখ হয় অশ্লেষা—
কোথা কালো কেশ বাঁধে নিশীথিনী তারি শেফালিকা-নেশা
মৃগমদসম আনে শত-শত তমালী বালিকা,
তরুণী অপরাজিতা ও মৃতার মুখ।
চিতার ওপারে বৈতরণীর সমুদ্র-ঝংকার
চির-মুদ্রিত, তবু জানি চির পরিচয়ে থাকো কৌতুকী, উৎসুক॥

প্রতিশ্রুতি

আকাশ অনেক উঁচু—
পৃথিবীর পর্যাপ্ত পরিধি
জীবনে অপরিমিত দিতে পারে ফসলের ঘ্রাণ ;
তোমার দেহের রেখা হতে পারে সমুদ্রের মতো রেখাময়,
সময়ের মতো স্রোতস্বান
হতে পারে আমার সময়!

পৃথিবীব দৃশ্য থেকে মুছে গেছে গরিমার দ্যুতি—
জীবনের, প্রাণের আবেগ।
কোথায় তোমার প্রতিশ্রুতি!—
বিষণ্ণ দেহের প্রান্তে বহু-বহু শতাব্দীর মেঘ—

দিনগুলো আমারো মন্থর,
দিনগুলো শতাব্দীর বন্ধ্যা বালুচর—

শতাব্দীও মুছে যায়
মুছে নিয়ে হেমন্তের অপরাধী অপরাহ্নগুলো,
আমাদের মৃত মুখ অতীতের নিয়মে হারায়।
আকাশ তখনো থাকে—
হারায় না পৃথিবীর পর্যাপ্ত পরিধি ;
তখন আবার যারা তুমি-আমি— সময়ের সফল সন্তান—
হয়তো পেয়েছি তারা সমুদ্রের, বিদ্যুতের মতো এক জীবনের ঘ্রাণ।

শর্বরীর জন্যে

তুমি অতন্বী তামসী পাষাণ অসিত-সত্তাময়ী। তবু চঞ্চল-চিত্ত। তবু যে লেগেছে অলকে আলোর স্পর্শ। উন্মীল হল নেত্র। নীল উর্মিলা হলে সীমাহীনা সীতা!

ভোলোনি ভোলোনি তিমির তোমার মর্ম। ভোলোনি যে তুমি অতন্দ্র বিভাবরী। আকাশে রাত্রি নামে।

আমার হৃদয় রাত্রিতে করে স্নান। মুঠো-মুঠো ছায়া মেখে নেয় চোখ, দেহ ভরে দেয় স্নিগ্ধ অন্ধকার। রুদ্র শোণিতে তন্দ্রা।

আমি কি সূর্য, বল বল বিভাবরী! তুমি কি ললিত আকাশ-লাস্য, আমি নীহারিকা-তাণ্ডব? বল, রহস্যময়ী। বল, বল কল-হিল্লোল কেন হিন্দোল হতে চায়!

আমার ছন্দে আমার বিশ্বে ছিল তরঙ্গ-ভঙ্গি! তুমি কে, বল তো, কে এলে বারুণী অরুণ-অরুণি নিতে? বনানী কেন বা অরণ্য হতে চায়! তরুণী তরুর কেন এ তমাল রীত? কেন চায় নীল উত্তাল সংগীত? তারপর কেন নিতে চায় হায়, গৈরিক বাস, কেন পিতে চায় পীত?

এই চির অভিসার! এই চির অভিশাপ!
আমার আগুনে জল ঝরে আষাঢ়ের।
তোমার ছায়ায় ঊষার আভাস জাগে শ্বেত শতদলে!
তোমার শিখায় আমার বহ্নি, শিখী-বর্হিনী, সে যে কত অদ্ভুত!
তোমার শীতল শিলার অলকে বল কে পাঠাল আমার চন্দ্রদূত!

দ্রাবিড়ার জন্যে

আকাশে প্রত্যুষা-লিপি স্বপ্নিকা উষার মনে আঁকে।
তেমনি এ মদালসা পৃথিবীর পৃথুলতা তামসী লতাকে
ডেকে আনে, কানে-কানে কয় সেই ছায়া-দূতিকারে :
'সই, শোনো, কোনো দ্যুতি নেই যার নারায়ণ তাকে
নেবে কি, নাবিক তার নৌকার বিলাসে
ফেলে নীল আকাশের ফেনিল উষার যূথিকারে?
রবি-প্রিয়া পুরবিনী জানি তার সুরভির গ্রাসে
অনিরুদ্ধ সূর্যনারায়ণ, বল, সে কি চেনে দ্রাবিড়-কন্যাকে?'
চেনে। তার নাম তুমি জানো না, মেদিনী।
যেদিন তোমার বুকে কামনার কামিনী-স্তবক
ফুটেছিল, তার মনে হৃদয়াভ কিংশুক-জবক
অশোক-পলাশ বুঝি অন্য মনে ফুটেছে সে দিনই।
সেই নর-নারায়ণ তাম্রবর্ণ, তাম্রপর্ণে লেখে
তোমার প্রথম নাম, প্রেম-প্রিয়া, প্রেমেরে ভোলে কে?

পথিকবনিতার জন্যে

রাত্রিমাখা ক্লান্ত পাখির মন
অঙ্কে যদি রেখেছ খানিকক্ষণ
ভেবেছি বুঝি করলে সমর্পণ
সত্তা নামে মিথ্যা ব্যাপারখানা।

ঘুম ছিল না তোমার চোখের কোণে
ভেবেছি তারা স্বপ্ন-আকাশ বোনে
কিম্বা মনে মৌন যা তা শোনে
জানছে চুপে হয়নি যে সব জানা।

জানতাম না ক্লান্ত দেখায় দ্যুতি
অঙ্কে-ভরা থাকলে মনের পুঁথি!
গন্ধে-হারা নূতন ধারায় যূথী
ধারাপাতের পাতায় কোথায় আছে?

এমনি যদি সুদের হিসেব নিয়ে
ব্যস্ত ছিলে স্বপ্নপুরীর প্রিয়ে
জানলে না তো ভ্রমরজীবন দিয়ে
একটি মানুষ কেমন করে বাঁচে!

প্রোষিতার জন্যে

তারপর তুমি একা। তোমার হৃদয়ে আমি একা।
সে মহেন্দ্রক্ষণ চলে গেছে,
সে আকাশে বজ্র বলে গেছে :
'সরোজিনী সূর্য নেই তোমার নিকষে দেখ শুধু হেম রেখা।'
শুনেছ কি ধ্বনি
মেঘের? মনের ঘরে মসীময় কাকচক্ষু জলে
আসেনি অমনি
একটি বিগত মুখ ঊর্ধ্বে-অধেঃ অকূল অতলে
অচ্ছোদ চোখের বাঁকে অচ্ছেদ, জুলেখা?
কবে কোন্ বক্ষু-তীরে ছিলে, ফের ইসুফের সঙ্গে হল দেখা
আজ, বাঁকা-ভুরু 'বাকি-কামানে-ওয়ালে'!
কত যুগ বিন্দু হয়ে ফিরে এল কেশতুল্য নলে :
তোমার কৈশোর-স্মৃতি শচী-হওয়া মনে-মনে-বলা :
"পাব তারে যদিও বা মত্তহস্তী কমলের বন দলে গেছে।"
সব প্রতিশ্রুতি ফিরে এল।
শ্রুতির ওপার থেকে সব কথা, কথা-দেওয়া বন-দেয়াসিনী
একটি দেবতা ঘিরে ফিরে এল ময়ূরীর মতো :
'ভূস্বর্গের গিরিশিরে কে সূর্য জাগ্রত
কার রশ্মি ঝিলিমিলি অরুণের রাগে এলোমেলো—
তারে বুঝি যুগে-যুগে চিনি!—
উজ্জয়িনী-কান্বকুব্জ-খাজুরাহো-বুন্দেলাকে ভুলিনি ভুলিনি,
ললিত-আদিত্য তুমি আমি হব তোমার নলিনী।"
সব ধ্বনি এক হয়ে শ্রাবণের কেকা!
কাশ্মীরি-বালিকা শোনে উল্লসিতা একা।

সব পদাঘাতে ফোটে তাই শুধু একটি অশোক
সব স্বপ্ন এক হয়ে পাটলি-কুসুম।
তারপর তোমার কি চোখে আছে ঘুম
তারপর কারুবাকে দেবদাসী হয়ে থাকা কায়মনে প্রদীপের শিখা!
অবশেষে একদিন মধুমাখা কামনার ফুরায় মৌসুম :
পুড়ে যাক ক্ষয়ে যাক রক্ষিতার দৈব বিষ সব নাশ হোক
আমি হব গণপতি তুমি দূর পাতালে গণিকা!

পাঞ্চালী বাঁধুক বেণী কর্ণ থেকে চির হৃতি-সমাচার
ছায়া হয়ে মিশে গেছে যেই নাম ফিরবে না আর।

ফিরবে না দেবযানী কুণ্ডে আর গৌরীপট্টে ভালে তার জ্বলে রাজটীকা-
হে কুচবরণ কচ, বহ্নিমান পার্বতীর দেহে আর পাবে না সে ধুম!
কুন্তী পাবে কুম্ভীপাকে পাণ্ডুরতা, নাটকের শেষ যবনিকা।

কে কারে বা পায়, শুধু মুছে যায় কপালের দেয়ালের লেখা।

কোথায় পেয়েছি বল কোন্ পর্বে আমার তুমি বা?
অমলিন অম্ল হলে তুমি নিশাদল
অগ্নি হলে তুমি সীতা নির্বাপিতা নিভা
সূর্য হলে সোনার কমল!

গেহিনীর জন্যে

দেবে কি আমাকে তুমি তৃতীয় নয়ন
পারো যদি দিতে তবে ভীরু পলায়ন
জীবনের জনপদ থেকে দূরে যাবে,
তুমিই আবার এসে তেমন সাজাবে
এই ভাঙা হাটের হৃদয়, পলে-পলে
তবেই তো বিপণিতে একে-একে জ্বলে
উঠবে বিদ্যুৎ-বাতি, তখন এ মন
উপাসনাময়, তার কত আয়োজন
জনসমাগম হবে বলে— থরে-থরে
এনেছি, দেখবে, ঘরে দুই হাত ভরে
সুবাসিত বেল-জুঁই, মধুফল কত
অনাবিল অপরূপ নিটোল অক্ষত,
দিয়ে যাই অকাতরে উপহার আমি
যার কিছু নেই, কিছু ছিল না, বেনামি
যে কেবল, যাযাবর পথে এতদিন,
উত্তর-পাহাড় থেকে সমুদ্র-দক্ষিণ
ঘুরে-ঘুরে দিশেহারা পাখির মতন,
শুধু বাকি আছে যার এ মাহেন্দ্রক্ষণ
তোমার হৃদয়-দ্বারে, কিছু নয় বেশি—
তোমারো তো আসতেই হত শেষাশেষি
এই পথে, তাই আজ বলি অনুরোধে :
(পুরাতন ঋণে যাব পুরো ঋণ শোধে)
ভুলে যাও ভুল পাপপুণ্য অভিমান

তাকাও প্রাণের দিকে, চাই এই দান,
আমার কপালে শুধু কাজলের আঁকে
অবিকল চোখ এঁকে দাও, যেন থাকে
তাতে স্বচ্ছ জল তবু দেখার ক্ষমতা
কারণে ও অকারণে মন সোমলতা
বলে যেন চিনে নেয় তোমারে আবার,
যেন দেখি, বারবার তুমিই আমার
ছিলে শিল্পী, স্বপ্না, নিদ্রা, বিস্মৃতি, শয়ন,
দাও জাদুকরী সেই তৃতীয় নয়ন!

অলকার জন্যে

দিব্যালকা, আকাশ আছে, আছে মেঘের কল্‌কা তার
আষাঢ় আছে কলকাতার।
নির্বাসিত যক্ষ আমি। সব হুবহু একরকম।
হৃদয় শুধু ব্যক্ত কম।

হৃদয় আছে? তেমন অকপটে কপাট খুলছে যার
দুলছে হাতে ফুল কেয়ার,
হঠাৎ জেগে বলছে মেঘে : 'স্মর-গরল স্মরণ-পার,
তোমায় দেখে বরণ তার
পড়ল মনে বন্ধু আমার চক্রবাকী যন্ত্রণার
ভার কি নেবে মন তোমার?'

আকাশ-নটী অট্টহাসে অট্টালিকা ক্রুদ্ধ চুপ
বয়না ব্যথা ঊর্ধ্বমুখ।
এ মেঘ নামে মনের মেঘে তাই কুহরে অহর্নিশ
অভিশাপের অহির বিষ।
কী করে আর পাঠাই রীতিমতো গীতির তেমন দূত
এ নাগরী মন অদ্ভুত।

সাংখ্য

তবু জায়গা থাকে।
তোমার ঘরবাড়ি, ক্ষেতখামার ছড়িয়ে দাও চারদিকে

তারপরও পুব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ, ঊর্ধ্ব-অধঃ থেকে যায়,
তোমার অশ্বত্থ-বট মন্দিরের পরও অনেক জায়গা উঁচু হয়ে ওঠে
হিমালয় মেঘ ছুঁয়ে গেলেও থাকে মেঘের ও পিঠ!
সমুদ্র দিয়ে তুমি ভরাতে পারো না সে স্থান
পৃথিবীর ব্যাস দিয়ে ন্যাস দিয়ে ফুরোতে পারো না—
সূর্যে, নক্ষত্রে, নীহারিকায় নয়।
মহাকর্ষের উপবৃত্ত পরাবৃত্ত পার হয়ে
আলোবর্ষের আলোবর্ষের অবনমিত অমিত জ্যামিতির শেষেও আবার আকাশ।
আবার স্থান—অসীম ঊর্ধ্ব, অতল অধঃ অপস্রিয়মাণ দিগন্ত।

থাকে সময়। ফুরোয় না।
ইতিহাসে ফুরোয় না সে আশ্চর্য আবহমানতা
ফুরোয় না কোনো বৃত্তান্তের বৃন্তে, বৃন্তে।
ঋতুর চক্রান্তে, বিষুবচিহ্নে, কর্কটে-মিথুনে কতটুকু সময়
পরমাণুর কক্ষপথে কতটুকু, কতটুকু বক্ষে, তোমার হৃদ্‌স্পন্দনে?
তোমার জলমাটি, বস্তুপুঞ্জে কোথায় আছে কাল
বেগে-আবেগে, আভায়-প্রতিভায় কোথায় কতটুকু ছিল
মুছে গেল কতটুকু বা
জানো না!
কী করে জড়িয়ে থাকে সময় তোমার ঘরবাড়ি-ক্ষেতখামারে
তোমার ভাঙা মঠে, পুরোনো অশ্বত্থের শিকড়ে, জানো না।
কী করে সময়ে জড়িয়ে থাকে তোমার ক্ষেতখামার, থাকো তুমি—জানো না।
জড়ায় কি? নিরবধি কালের নদী জড়ায় কি তটের হৃদয়?
গড়ায়, ছেড়ে দিয়ে সরে যায়—সরে দাঁড়ায়—গড়ায়।
তুমি শুধু জানো, কিছু ছিল
কোনো প্রভা বা নিষ্প্রভতা, প্রাণ বা মৃত্যু অনুভব কর—
তাই জানো, বলতে পারো কিছু ছিল, আছে, আসবে।
তোমার অনুভব এই সময়,
তবু এক সময় আছে যা তোমার অনুভব নয়,
আছে এক আশ্চর্য আবহমানতা।

আছে।
তোমার সীমা ছাড়িয়ে বিশালতা
তোমার অনুভবের শেষেও স্পন্দন।
নিঃস্পন্দতা আছে যা স্পন্দন হতে পারে।
আছে শূন্যতা যা হতে পারে বস্তুময়।
আছে।

তোমার বাইরে, মুঠোর বাইরে অপরূপ রূপকথার প্রান্তর মাঠ—স্থান,
স্থানের অরূপ স্তূপ শূন্যতার মঠ—আকাশ,
পূর্ণ হবে বলেই শূন্যতা।
তোমার ঋজুতা ছাড়াও অজস্র আঁকাবাঁকা রেখা আছে
রেখা, গতি, ভঙ্গি, ছন্দ,
বেগ, আবেগ—অনেক—অনেকেও এক।
এক হয়ে তারা জড়িয়ে থাকে ইতিহাসের অতীতে।
আছে। —তা-ই কি শেষ কথা নয়, তোমার,
জ্ঞানের, মনের, জীবনের, মরণের সব কিছু নয়?
কেউ থাক, কিছু থাক—
তা-ই, শুধু তা-ই
তোমার থাকার সান্ত্বনার মতো তোমার না থাকার শান্তি।
তোমার অবসানের শান্তি কারো অনবসানে।

কিছু থাক, যা তুমি নও
তোমার শেষের শেষে অশেষ,
শুরু আর শেষ নেই বলে নয়,
বারবার শুরু আর শেষে যা উপস্থিত
শুরু আর শেষ হারিয়ে যায় বলেই যা স্থিত।
হোক তা জ্যোতির জ্যামিতি,
কোনো আকাশ, বৃত্তাভাস, নমিত রেখা,
কোনো প্রমিতি, প্রতীতি—
তবু তা আছে—উপস্থিতি আছে তার।

তাই আছে তোমার ঘরবাড়ি, ক্ষেতখামার
স্থল, স্থান, দিকদিগন্ত,
শীত-বসন্ত, অয়নান্ত আছে তোমার—
আছে হৃদ্‌স্পন্দনে সময়
আর নিঃসময়—মৃত্যু॥

বাঁকা-চাঁদের নায়িকাদের জন্যে

শোনো তবে সই শৈবলিনী
আমি প্রিয়তম নই বলিনি।
তবু যে কুমার তোমার চুমার প্রতাপ কত

সইব বলোনা শৈবলিনী!
কপালকুণ্ডলারে চায় যেই মৌনব্রত
কাপালিক তার হও নলিনী।

হতে যদি তুমি শৈবালিনী!
বৈশালী আজ কই মালিনী?
মলিন কন্যা বনের বন্যা অন্ধকারে!
দূর সে হৃদয়, শৈবালিনী—
জাভা-বলী দ্বীপে এখন দীপ্তি মন-দুয়ারে
স্মৃতিদয়িতারা বৈকালিনী!

হায় বৈশাখী শৈবলিনী
কালিনী-যমুনা, চাও কলোনী!
রিফিউজি গলে রাধা-বিস্বাদে কালীয়া হল!
কিম্বা শৈলী, শৈবলিনী—
এই যদি মনে এখানে আয়েষা-আয়াস বল
কেন ব্যাঙ্গমী হও দলনী।

বিদ্যার জন্যে

আমি খুঁজি বিদ্যারে আমার।
কোথায় লুকিয়ে আছ কবিতার দ্রাবিঢ়-কন্যারা?
কোথা মন অতনু-শ্যামার!
মেঘমালা, নীল কাজলিকা
তোমরা নীহার নও হিমালয়ে তুষার-জালিকা
নীহারিকা নও তো যে আকাশ-গঙ্গায় হবে হারা।
তবে কেন দেবতার মতো
দুহিতা-দয়িতা বল নয়ন আনত!
চাও, চোখ মেলো অন্ধ-মেয়ে
স্মৃতি মাগে মেঘ-কন্যা বিস্মৃতির ব্যথা খুঁজে পেয়ে।

কুমারী নিদ্রিতা,
জাগবে না? চিরদিন মনে রবে অভিশপ্ত চিতা
অতীতের মিথিলার মিথ্যা কলরবে?
কোনো জীবনেই আর পেলে না তো তবে
বিদ্যাপতি সুন্দরের দেখা! —

কে তোমারে দেবে ভাষা করবে কে মৃগচক্ষু দান
কোন্ উদয়ন বক্ষে টেনে নিয়ে শেখাবে বা গান
কোন্ চন্দ্রাপীড় হবে রক্তিম-অধর প্রীতি-পর্ণে পত্রলেখা?
পরিশেষে গোধূলির গন্ধে-ধূমে স্বপ্নের প্রচ্ছায়
সিন্দুরে সীমন্ত-রেখা টেনে দিয়ে দেখাবে কে মৃত্যুরাঙা পথ-
অদর্শিতা যদি তুমি না ভোলো শপথ?

বল, কাঞ্জী, তবে কেন তোমার ছায়ায
শুধু মৃত নীলের মায়ায়
উত্তরিবে অশ্ব-মনোরথ?

পদাবলী

প্রাকৃত-পিঙ্গলা

ওগো চূতমঞ্জরী অচ্যুত-নয়না তোমার প্রথম চাঁদ এল
তোমার প্রমথ চাঁদ তোমাতেই অবশেষে ফুল্ল অলকদাম পেল
ঝুরঝুর মুকুলের বর্ষণ
দক্ষিণ-বাতাসে আকর্ষণ
ঘটনা ঘটালে বিধি বিধুমুখে সীধু এনে কদম্ব-রোঁয়া
ফাল্গুন-আষাঢ়-মাঘে এমন আলিঙ্গন এমন রোমাঞ্চ এনে দেয় চন্দন-চুয়া
মন্দানিলে কি ছিল এত কেতকীর মিঠে ছোঁওয়া
এমন সুগন্ধ ধোঁয়া?

আবীর-আবিল যবে সব দিক
পাশে রেখে সেই ছবি পাবে ঠিক
পীবর আভাস তবে বার্ষিক
জল ভাসে কেন চোখে ধিক্-ধিক্!

(শ্রীমতীর কান্ত যে থাক্‌ছেনা পাশে বুঝি তা-ও মনে নেই!)
অভিমানে মানে নেই
বসন্ত-পিক এল বল হরিচন্দনা খঞ্জন-নয়না প্রিয়-সখা করবে একেই।

হাড়ি-ডোমিনী

রজনী পোহাল জয়িনী তোমার গালে।
নূতন সূর্য উজ্জয়িনীর ভালে!

পূর্ণিমা-চাঁদ কাঁদে এ ইন্দ্রজালে।
তুমি যে এখন সূর্য-দয়িতা চিনি
আমার প্রেয়সী ছিল বুঝি নিশীথিনী
ভুল শুনে তার কঙ্কনা-কিঙ্কিনী
এলাম-নীলিমা তোমার কুমোর-শালে!

দেবদাসী

অলক্ষ্যলক্ষণ চিত্ত।
শূন্যেব কিন্নরী চায়।
আকাশ-মুলুকে পারিজাত
অশোক-মুকুল প্রতিমায়
তার হাতে বাড়ায় কি হাত?

"দেখছ কি হাত না কি হাড়
ফিরে এস বিত্ত আমার—"
পৃথিবীর ডাক শোনো নিত্য।

সেখানে কি হল? কালো নেই
ক্ষুধা মিটে গেল নিমেষেই।
এমন সুধায়ও জ্বলে পিত্ত!

যোগিনী

সোনায় তরুয়া হ্‌ও তুমি প্রিয় বিশাখা হবনা আর
আমি হব শাখা অপর্ণা যদি বল।
তবু বিদ্যুৎপর্ণাকে তুমি চেয়ো না বারংবার
ছলনাময়ী যে চোখ যার ছলছল।
আমি জল-পথ হব পাবে তুমি আমা৲তে আলেয়া শম্পা
ভগীরথ হ্‌ও তবেই তো শেষে সীতা-রাম হব, পম্পা
সরসীর তীরে মধুচন্দ্রিমা পাব থাক অভিশম্পাত।
কিম্বা আমিই পারুল তখন তুমি চম্পায় সাত!
ধরো হ্রদ নয়, আমি নদী আর হবে কি তুমি-ও নদ
গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র মোহনা কেমন প্রেমাস্পদ
সমুদ্র-নিভ, নিবুনিবু দূরে তালতমালের শিখা
আমরা দু-জন কূজন-মুখর, নাম নেই অনামিকা।

জয়দেবের পদ্মাদেবী

এবার কানুর দেহ দেবী চায় জানো তো বড়ায়ী
বৃষভানু-দুহিতারে বল সব গোপিনীর গোপন কাহিনী
পঞ্চশরে ছিঁল যেই বসন্ত-বাহিনী

এখন সে নাই
আমি বারোমাসে শুধু এক মাস চাই
একমাস পদতলে দিতে বোলো ঠাঁই।
শুধু প্রাণ-বৃন্দাবন নয়
মথুরায় রাজ-কাজ পড়ে আছে কত
তবু যেন ব্রজভূমি নিয়তির মতোই নিয়ত
ডাকে তাই দান করি আমার বিনয়
অবনত হতে জানি আমি-ও সে সুগতের মতো।
জেনো রতি-সুখ-সাবে পারি ভস্ম করে দিতে প্রমত্ত মন্মথ,
বুকের উপর দিয়ে টেনে নিয়ে যেতে পারি জগন্নাথী-রথ,
সব পারি বোলো সেই সুভদ্রা-উমারে
শীতললক্ষ্যার কথা বলছি তোমারে।

চণ্ডীদাসের রজনীগন্ধা

শোনো রজকিনী রামী
আমি আজ রাম আমার আরাম
দেবেনা যামিনী-যামী।

জানো কি জানকী-বালা?
জানো বল্লভা তাই গাঁথ বুঝি বেলা-মল্লিকা-মালা!
বলতে পারো না সই
উপোসী-পরান পারণ করতে জানেনা যে আমা বই!
নির্দয় দ্বিধার কেন ধারো ধার
চেনোনা হৃদয়-স্বামী!

নিদ গেল দূর ভোরে মন ভোর। আগুনের ফুল ভুলে
তাকাবেনা তবু তাপিতের মুখে শীতল নয়ন তুলে?
ভুলতে পারো না সই?
তোমার কারণে ফুলকির জ্বালা দাও আজ তবে সই
ও দুটি চরণ স্মরণ-মরণ
শরণ নিলাম আমি॥

বিদ্যাপতির অনুরাধা

কথায়-ও কি দেবে আবরণ?
অভিসার না-ই হল ষোড়শোপচারে, কন্যা চাঁপার বরণ,
সেখানে কাজরী গান, ভীরু তুমি, ভুজগের চাওনা সরোষ গরজন।
সামান্য এ প্রতিশ্রুতি পাইনে শ্রুতিতে কেন আমি কি এমন পর-জন।
পরিজন নই আর তাই প্যারী কানে-কানে কথাও বারণ?

হৃদয়ের তল থেকে কী আর কেয়ার-ধুলো তোলো
কী কথা খোঁজার আছে বল
ছলছল চোখে যদি এমন লোহিত লেখা হল
কেন কর অহিত স্মরণ
জ্বলন্ত আখর এঁকে কেন ফিরে এ মনোহরণ?
কেন তার ধ্বনি নেই, বিবসন নয় কেন রসনার কাজ
সুর আছে, ধনি, তবু সাহস দেয়না মন, বচন ছড়াতে মানো লাজ॥

মাধুকরী

ভ্রমণে হয়তো ভ্রম আছে।
মনে হয় দূরে যাবা সোনার ভ্রমর
তাদের মধুই সুধা (বসুধায় কে কবে অমর)
তুলনায় কিছু নয় যারা ছিল ছায়া হয়ে কাছে।
যারা ছিল জ্বালা-ধরা চোখে দিতে জল
মুছাতে চোখের জল বুকের অনল
অবিরল বর্ষায় ঢেলে দিতে তারা-গলা অজস্র মুক্তার নবনীত ফল
সমুদ্র-শুক্তির বক্ষ নিছনি যারা হার গেঁথে দিত গলে পাছে
ভুলে যাই ভুলে থাকি ভুলে গেলে জীবন না বাঁচে
সেই ভয়ে।

সেই ভয়ে কত না যাতনা
দিবস বিবশ করে দিতনা মনের ঘুম দিতনা রাতওনা।
আনতনা বসন্ত সান্ত্বনা বিচ্ছেদ শঙ্কাই বিধূনিত মনে-মনে : কী ভাবে সইব এ
ভুল করে জীবন না বাঁচে!
যখন দ্যোতনা তাই সব মনে নূতন মলয়ে
সব পিপাসিত বাহু পাশ হয় মনে লয় ছাইপাঁশ কি কাজ বলয়ে
তাদের কেখলি যেন মনে হত বামেতর আঁখি বুঝি নাচে!
এমন মধুর বুক এমন বঁধুর মুখ ফেলে কি ভ্রমণে সুখ আছে?

গৌরী

বিকেলের হাওয়া যদি নিরিবিলি বিলি কাটে চুলে
বিলোল সে বিলেখন-বিলেপন হয়না বিলীন।
বিঁনি সূতে নিশুতির স্রোতে গাঁথা বেলফুলমালা
পাবে না অরণ্যমনা মালিনী, বিফলে ফেলে দিতে!
সে-চুল বিলানো মত্ত মলয়ের হাতে কোনোদিন
ভোলায় না চীনাংশুক জ্বালা,
ফুলের বলীর রেখা স্মৃতি হয় চুলের বেদিতে
যূপের মতন চুপ থাকে অহরহ।

সেই অভিশাপ আর জাগর বিরহ
পারোনা, পারোনা যেতে ভুলে।

বিকেল হৃদয়-হ্রদ। তার জল যেন ইন্দ্রজাল
খানিক সবুজ আর সব বুঝি বেগনি-গুলাল!
তাই তার তীরে লাল ফাল্গুনের ফুলের বাসর।
ছাড়পত্র পাওয়া বালিহাঁস যাযাবর
ঘরে আনে সুদিনের পরভৃতিকারে
স্মৃতি যারে
যার স্বর
দু-দিনেই ভুলে যেতে পারে,
চিঠি যারে দিতে পারে পাখের কলমে লিখে অনেক আখর।

জলে পড়ে অনিবার ছায়া।
নিকায়ে সে ছবি তুমি বলতে পারোনা, সবি মায়া!
বিকেলে অনেক স্মৃতি ফিরে আসে মনে অনাবিল
তিস্তার পারে-পারে ঘিরে আসে যেন চকাচকির মিছিল।
মনে পড়ে, আমাদের ছিল নদী, ভিজেমাটি, বুনো খালবিল
তোমার নয়নে ছিল নীলিমা নিমীল বিলসন
ছিলনা নটীর কটি, তবু পাট-শাড়ি হত শিথিল-বসন
চেরীর মতন লাল পিচ্ছিল চেলির পরশন
বিছিয়ে পাটির ছক ছিল, প্রিয়া, তবু পাশা খেলা, কলাছলা,
রাজ্য-পাট সমুদ্র-মেখলা!
মেঘের বরণ চুল সন্ধ্যা হলে দিত হাতছানি
খোপা খুলে দিতে ধূপ, পল্লীর রাখাল
সেই রূপে পেয়েছিল মহুয়ার মধু-ফুল, বেহুলার ক্ষীর-ননী গাল,
গোপিনীর বিহঙ্গম ময়নার মতো মন কালো দেহ তবু স্বচ্ছ স্নেহের মাখানি।

তোমার প্রতিমা উমা, আজো ভাঙানি!

ব্রজাঙ্গনা

[শ্রীবুদ্ধদেব বসুকে নিবেদিত]

ফুলের মতো উঠত ফুটে আমায় পেলে সিন্ধুতীর
বিলাস বুঝি বলত তারে কবি,
অল্প আভরণের শোভা বিচ্ছিত্তি কোন্ দূতীর
তারেই নিয়ে মাতিস্ আঁকে ছবি।
ক্রন্দনেতে হাসির মৃদু ভাঁজ।
মনের মোনালিসায় আঁকি, সোনালি দাগ সে-চিত্রার
দাভিঞ্চিরা চৈত্রে পাবে আজ ॥

কোথায় তুমি তেমন মেয়ে বক্ষ কাঁপে, বসন যায়
দেহের ভেলা হেলায় বেয়ে যাও!
আমার নামে তোমার নামে প্রদোষ উষা-সন্ধ্যা পায়
আমার তুলি. তোমার হাতে নাও!

তেমন লীলা না-ই বা হল, কমল-লীলা কী দরকার!
পিকাসোরাই সুরুর সুরে ভরা।
তুলির ব্রজবুলির সুরা চাইনে পুরা-বিদর্ভার
ব্রজাঙ্গনা, দিচ্ছ যদি ধরা॥

ভারতী

উত্তরফাল্গুনী

পরিচ্ছন্ন সূর্য-শিখা উত্তর-অয়নে।
তার রূপ নিই আমি নয়নে-নয়নে।
দ্বীপের অনুপ
সুমেরু-বিস্তার নেই আর দ্বীপান্তরে।
দৃষ্টি স্থির উত্তরের স্তূপে।
লক্ষ্মী নিয়ে দূরে ঘটোৎকচ যায় সরে।
ঘন্টা বাজে শুনি।
তারা দেখি উত্তরফাল্গুনী
হট্টগোল আসে অপরূপ।
'হট্ট' নাম শুনি।
বেশ আছি, শৃঙ্গ নেই, মৃগনাভি-কৃষ্ণসার ধূপে।
শকুন্তলা-ললিতাকে নিয়ে চলে যাই অন্য রূপে
ভঙ্গি এক, বৃক্ষে-হাত চোখে চন্দ্র-নেশা।
ধ্বনির কলস ভেঙে আমার দু-চোখ
ব্যস্ত 'হট্টমালা' 'চন্দ্রা' যক্ষী আনয়নে:
তির্যক দু-চোখে তারা একদৃষ্টি যেন দূরান্বেষা,
পক্ষীর আলোক।
এখানে থেকেও ভিন্ন দৃশ্যের নগরে মেলামেশা—
মধ্যভারতের এক ভরত-প্রান্তরে।
তার যে প্রতিমা পাই লোহিত-পাষাণীকৃতা, তাই
রামায়ণে-অনুরাগে কিছু রেখে যাই :

জানিনে তা তারা মাছ কিনা ;
তাকানো চোখের সেই নিভৃত আলোতে

দেখেছি সময়
অবিরত অতীত যে হয়
ভবিষ্যৎ হতে।
শরীরের তীর তাকে পায় না সমুদ্রঢেউ বিনা॥
তারামৈত্রী মনে আমি তাকাই ত্রিপুরে
শুনি বররুচি-কণ্ঠ বলি সেই সুরে:
"তপনতনয়া, তুমি আলিঙ্গন করবে আমায়?"

সর্পছায়া, লালমাটিচিত্র থেকে কোনো মীনামতি যে নামায়
তাকে মৈশরিক ক্ষেত্রে পাই।

ভূতপূর্বা মনোবাসনাই
গোপীবিহঙ্গিনী, ওড়ে, ওড়ে দূরে পর্বত মৈনাক
নীল-নদী উষা কন্যা সমর্পণ করে এই পুরে।

"কোন ক্লিওপাত্রা
দিল এই রাত্রি
তোমায় আমার"

ভূতপূর্বা ধ্বনি এসে আমার আশ্লেষে
ঘষে তার সর্প ফুল্ল-নাক
আমি আজ পারব কি তাকে নিয়ে যেতে কোনো আশিস-আলোকে?

পূর্বফাল্গুনী

অশোকমঞ্জরী ফোটে, সাঁচিস্তূপে আটবিকা ফলে নটীরূপে।
আমার মঞ্জরী-কথা যায় ধ্বনিসিন্ধুর অনূপে
জানি মনে-মনে।
তবু থেকে যাই আমি শব্দের বন্ধনে।

*

শঙ্খ বাজে ঘরের সন্ধ্যায়।
সমুদ্র বিদায় নিয়ে রেখে যায় দুর্মর পাহাড়—
দুই ফোঁটা রক্তে বন তৃতীয় প্রহরে
এনেছিল কোন্ চিহ্নে ঘরে?

পিতলে প্রদীপ জ্বলে, পোড়ে ধূপ, তবু বুঝি পায়
রক্তভেদী শব্দ তারে যে ফিরে আসেনি ঘরে আর॥

"পাহাড়ে মন্দিরস্মৃতি ছিল,
নদীর জীবনে তাই হইনি নাবিক।
নিঃসঙ্গতা যত ব্যথা-দিক

হোক তবু অভ্রভেদী ধ্রুবতা-আসীন।
নর্তকী, তোমার জন্মদিন,
মনে আছে, ভুলি নাই তিলও॥”

*

রাত্রিশেষের শুকতারা
জ্বলে ওঠে নিভে-নিভে কুয়াশায়।
দেবে কি কোথাও সুখ সাড়া?
সুপ্রভাত কী প্রসূ আশায়
আসছে? যে রত্ন-বিভব
পলকের, মুছে তা-ই আসবে সে,
মেঘে আঁকাবাঁকা রেখে স্তব
স্লেটের দাগেই যাবে শ্বাস ভেসে।

চলেছি প্রথম আলো থেকে,
আকাশে প্রগাঢ় হয় সন্ধ্যা-অনুরাগ
আকাশ যায় কি তা-ই রেখে?
নক্ষত্র তারার ক্ষপা নিয়ে সে তো আভাসে বিলীন
কতটুকু সময় বা রাগ রঙ হৃদয়ে সজাগ?
শোধ সে করবে কার ঋণ?

*

শরীর, আকাশ তুমি হয়ে গেছ হেমন্তের দিনে
এতটুকু বৃষ্টি নেই, ভৌম নীল ধরে!
আবির মেখেছ বুকে, বীর দেখ কতদিন পরে!
হল সব ফিরে যাও সুন্দর সে ঘরে।
প্রধূমিত হয়ে কেন পা বাড়াও মধুমাস মীনে
যাও-যাও ফিরে যাও তার চিরঋণে
রজতের বিন্দু ভুলে গেলে ফের অহমের বরে

রজকিনী লাস্য কি হাস্য তো দেখলে সড়কে।
স্বপ্নের পুকুরের পুষ্করিণী
যতটুকু মাটি দেবে চায় ভরণী।
তোমারি তো রীত-কাম, স্মর, ধর কে!
মঠ-বট খোঁজো মঙ্গল কর কে—
দেবদারু-তরু-হারিণী?
শোনো কে, ধনী।

“কেন এই পুরানা গুহায়
এসে মৃতা পৃথিবীর কর অভিলাষ?”

রাত-জাগা সে নগর রজনী পোহায়
চার প্রহরেই আলো, বন্ধ্য যে বিলাস!
তবু কি করুণ চাঁদ ওঠে—
লিপ্সায় মুখে বুকে, অধরে বা ঠোঁটে!

চৈতালী

বৃষ্টি হয়ে গেছে পূর্বফাল্গুনীতে, মন-ফল্গু জানে।
দেখেছে গুমোট, তা-ই স্বপ্ন-ছদ্মে করে বিতরণ।
সব ছদ্ম-স্বপ্নই তো ধ্বনি!
বৃক্ষাকাশ-বিম্বিত ধরণী চলে সূত্রান্বিতা মণি।
মৃণাল-হংসিনী কবে মৃণাল-পদ্মিনী হল, তার বাক্-ধ্বনি
দিয়ে আজ আরো চিত্র করছি বরণ।
এ চিত্র-সঞ্চিত-ধ্বনি স্মৃতি শ্রুতি মানে।
'উচা পাবতের' থেকে কোথা নামে 'সহজসুন্দরী'
দৃষদ্বতী-গঙ্গাধারা নয় সে দৃষ্টিতে দিক্‌শূল।
পায়ে-পায়ে 'মোরঙ্গীর' দেখি অন্য দাগ।

দৃশ্যাকাশে সুদামিনী যেন বৃক্ষমূল
বৃক্ষময়ী গঙ্গারোধী ধরে বিম্ব—ফুল্ল অনুরাগ।
সদ্মনীর 'বৃক্ষাকাশ' হয়তো বা এমন বন্ধুরই।
সুবন্ধুরে হৃদাসনে নিয়েছি সম্মানে,
অখিল ভুবন দৃষ্টি পায় দণ্ডী-চোখ,
বিস্মিত করেছে তাকে কাশ্মীরের ধন্য 'ধ্বন্যালোক'।
আমি পঞ্চমাস ধ্বন্যাধ্যায়ী
তৎপর দেবশিল্প-পায়ী।
'সদ্মনী' ও ঋত্বিকের ঘট।
তার ধ্বনি শুনে এল যে পৃথিবী অস্থিমজ্জা স্থায়ী
সে যেন নিভৃতা পিতামহী,
করতলে জল তার 'বদর' সমান।
দিক্‌ভ্রান্তা ধর্মান্তরে, এই চোখে হয় না প্রকট—
হলেও সে নাভিকেন্দ্র, এমন বিরাট
শ্রীহট্ট, যে সাধ্য নেই বোঝাব সে ঠাট,
নেই সেই শিলেটের জ্ঞান।
আমি সূত্রে মালা গেঁথে যাই
দেখি শেষ স্বপ্ন-বিম্বে কী যে চোখে পাই।

কোথায় শশাঙ্ক-নাগ পড়ে আছে কত স্থানে উপরে ও নিচে
সময়ের ধ্বনি-রীতি-নীতি আমি ছড়াই সম্মুখে আর পিছে

ছিল না হয়তো প্রয়োজন,
শুধু আমি নিজে বুঝি প্রতীক-প্রতিমা আর বিশ্বের ওজন।
হয়তো সংস্কৃত হবে প্রাণ
যে প্রাণ করুণ ছিল, ছিল না আঘ্রাণ॥

বিম্বধর

কৃষ্ণসার যে বুকে মৃগতৃষায়!
মরুক, এ বুক হয়ে আছে তার মরু।
মৃগাঙ্ক আসবে সে নিশি কৃষ্ণায়
মরুর বালুতে কারুকাজ দিতে সরু॥
প্রাচীন আহ্লাদ
পড়ে আছে—যেন ফুলে-ঘাসে
কী নগণ্য! নগরের স্বাদ
মেয়েদের চুলের আকাশে
প্রাচীন যক্ষিণী হাওয়া তোলে
তারপর নিরন্ত আষাঢ়।
ভোলে মন ভোলে
পৃথিবীর কথার কামনা
ধানের অঙ্কুর পেয়ে, নিঃশ্বাসের কণা,
বসুধা কুটুম্ব হয়, প্রশম আসার।

"হে মিশরী বৈদেহ অতনু—
কেন 'উমা' খোঁজো মোর বর্বরের দেশে?
কোথায় দেখেছ হরধনু?
রামায়ণী দেশে?
নেবে বুকে সতীর আশ্লেষে,
ফেরাবে তো অন্নপূর্ণা-বেশে?
পাহাড় হয়েছে ভেঙে পাড়
বুজিয়ে যে নদী-অপরাধ,
তার কান্না সুরে বুনি তার শাড়ি-পাড়
সে মানবী—পেয়েছিল লোনা সাগরের বুঝি সাধ॥

*

দুটি নদী হ্রদ আহ্লাদে মিশে গেল।
আমি মনে ধনুকের জ্যা-ই যাই এঁকে
ভারতের তিন দিক নিয়ে।
এ ভারতী বহু ভারতের এক দোল।
রামায়ণী গানে মাখি, সীতাময় কে কে?

আসবে বা কখন কনিয়ে
বিম্বাধরার মতো মাটি পালটাবে তার আকাশের ভোল!

কোনার্ক
॥ চৈত্র ॥

জম্বু ছেড়ে আসি, তুমি বিরাজিতা ভূমি
সমুদ্র-সৈকতে। কান্দে নদী বালু তলে
শুনি, সে নর্ত্তকী ছিল প্রাক্ দৈত্যপুরে...
ময়নামদানবের মায়াকৃতি তোলে আজ ধূমই!

কোনো চিহ্ন নেই, কোনো চিহ্ন নেই ইন্দ্রপ্রস্থে, ঘুরে
সিন্ধু ভরতের দ্বার, সামনে তাকাই।
আকাশ-মন্দিরে চন্দ্র, পিতলের বেল
বাজায়, তারি ধ্বনি চিত্রে মাখাই।
ভুলি নদীকান্না যত ঘনায় বিকেল!
কি সুন্দর চাঁদ উঠে জ্বলে
আমার হাতের লীলপদ্মপত্র হলে নীল শুধু
শুকিয়ে, তারো আলিঙ্গন
এ-পুরীতে, পূর্ণচন্দ্র সেই অপেক্ষায়।

কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম?

চন্দ্র, সূর্যতারা ফুল মনে-মনে সবাইকে ভাবি!
বেল বাজে তার ধ্বনিতেই আছে শ্রুতির দাবী
সেই ধ্বনি যেন বেল-ফুল ·
সেই ধ্বনি গোল যেন বেল
গোল সাদা হ্রদ-সমতুল।
মন তরুলতা চায়, নিকষিত হেম
এ দরিদ্র চাইবে না আর ;
হয় মেঘে ধূসরের ভুল
ঘনালে বিকেল।

*

গোল করে কাটা এই হীরার দুপুরে
সব মঞ্জুপুরী ঘুরে আমি অর্কপুরে।
শ্বেতাস্বিনী আসে পায়ে-পায়ে।

এ অর্ক প্রসব করে নীলাভ বিস্ময় :
শ্বেতপুষ্পা বসুমতী যেন মহাশ্বেতা!

বীণা ফেলে কাছে আসে নীরব সময়।
এ ফুল চয়ন করে গন্ধা নয়, পাই কুন্দফুল।
হিমালয়ী তুষারের হাত যেন দাতা।
নেত্র সব ফুল ফেলে সেই ফুল-নেতা।
নীল দৃষ্টি বেঁধে যেন তীব্র ত্রিশূল—
কেউ নেই, শূন্য স্থান—ফিরে দেখি হলুদে রাঙায়ে
এ স্বপ্নের সব কিছু দিয়েছি মনের জগন্নাথে।
বন্ধ করি খাতা।

পুরীর পথে

হলুদে বিষের মাটি ভাবি,
সেখানেই ছিল বুঝি নাভি
নাবিক এসেছে সেইখানে
হোলির হলুদে মন টানে :

শ্রেষ্ঠীর উজানিয়া-পুর :
'চারুদত্তে'র নাম সুর
ঋষি-দাসি তোলে পাই ঘ্রাণে :
মনাপা দয়িতা চ—
একা ধীতা পিয়া চ—॥

দাও মনোজল মৃতা প্রিয়া।
উজ্জ্বল হোক হৃদ-হিয়া।
দাসীপুত্রের 'চারু' চালু
উজানিয়া ধ্বনি শুনে পার হই বালু॥

পুরী

দরজা খুলেছি দেখি আকাশে ভীষণ নীল শিখা
পৃথিবী ধরেছে বাতি, আকাশ একটি নীল ডোম।
তারকনাথের নীল বাতি!
চৈত্রচড়কের মীন ঘোরে।
জল নেই, তাই মীন আকাশের হোম।
জল দাও হে আকাশ, লাগবে না টীকা।
আমি ঘাসে নামি, দেখি তারকিতা রাতি
চিত্রা চৈত্রে জ্বলে, পোড়ে।

কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম

রজকিনী প্রেম।।

কাচ

সমুদ্র নীলের জল তৃণ ও কলস,
দুটি মীনকন্যা চুপ যেখানে অলস ॥

মাথুর

চন্দ্রের গগনবৃন্তে শশ মৃগ রাকা নৌকো অশ্ব আজ নয়।
আমার ধমনী চায় অন্যের হৃদয়
অন্য রমণীর ধ্বনি যা আমার মনের অপ্সরী
তাকে নিয়ে কাটে বিভাবরী
সুপ্তির নির্জনে।
তার দেওয়া মুখ পড়ে মনে :

পদাবলী

তোমাকে অনেক দূরে ছড়িয়ে দিয়েছি বলে ব্যথা
ঘন গাঢ় হয় মনে, তুমি সঙ্গে আছ, বল কে তা
জানবে বা তুমি ছাড়া, আমিই অতীতে ভবিষ্যতে
তোমাকে ছড়াই স্বপ্নে, না পেয়ে আলোয় চলা পথে।
আমিই তোমাকে সঙ্গী ভেবে যেন সুগৌর প্রভাতে
একটি মধুর হাত থেকে নিই বিধুর অপর কোনো হাতে

*

তবু তা-ই ভাল চণ্ডীদাস,
তোমার আবন্তী চলা নয়—
আমার পায়ের নিচে ঘাস
আমি শূন্যতারে করি ভয়

*

একটি সহজ রোদে নীল শাড়ি শুকোয় দুপুর।
হাওয়া তাতে পাল তোলে, ডাকে ;
মেয়েটি ঘুমিয়ে আছে বুঝি তার বাঁকে ;
ছুঁয়ে থাকা যায় তত দূর ॥

*

জেলেরা শুকোয় রোদে জাল।
তারি আড়ে শাড়ি ঝোলে নীল ডুরে লাল।
নদীর জলে কী রক্ত খেলা করে, মাছ না কি মেয়ে
জালের ধূসর ত্বক বেয়ে!

*

নিতে শুধু দেখার ছোঁয়াচ
কালো মাটি দুটি স্তম্ভ হয়ে

স্নায়ুর মতন, তুলে ধরে গাঢ় সবুজ পাখায়
গোল দুটি মেশামেশি চোখের বলয়ে
এক দূর দৃষ্টি, আজ আকাশে তাকায়
দুটি তালগাছ॥

তুমি আমার অমানিশার সমা নিশার ফুল।
'দুটি তারার দ্যুতি হারার নেশায় ঢুলুঢুল।'

ধমনীর ধ্বনি এক হওয়া চাই, চণ্ডীদাস, রামী সেই ধনি
হৃদয়ের তাই রক্ত ধ্বনি।
না হোক সে দূরান্বেষা অপ্সরী ভিনাস,
'সমুদ্রের পাখি' সীতা রাম-চোখে অপরা রমণী।
সহৃদয়হৃদয়-আহ্লাদা
তার বর্ণ যা-ই হোক, সেই তো গোপিনীদলে রাধা।
অনুরাগ বর্ণ এক হওয়া চাই শুধু।
তা যদি আলাদা
আভাসিত হয়, হবে সীতা
ব্যক্তি নিয়ে ভীতা—
'বেল্লদ্বলাকা' কাব্যে দ্বিধা-চিত্রে চায় সে বিনাশ।
সব দেবী-মানবীরা অলীক জন্মের ব্যথাসুখ নিয়ে আকাশের ভাস।

তুমি চলে যাও থেমে হয়তো না থেমে
থাকে ধু-ধু পথের দুপুর।
তবু ভোর-ছায়া থেকে আসছ যে নেমে
দূর থেকে দূর
অনিবার এ রোদের মুখে ছায়া রেখে
নম্র করে তারে
সময়ের সেই আরামেই রাখি ঢেকে
যা থাকে দ্রবিল মেগে আর জলধারে॥

ঘামল লাবণ্য নীলা মেঘলা হাওয়ায়।
যদি জল পড়ে ভয় পাছে বা খোয়ায়
এমন খোঁপায় সব পাক
ভাবে তা-ই রোদ কিছু থাক—
চোখে যদি নেয় এই তনু
বল্মীকের রামধনু ফোটে, আমি ভাবি হরধনু॥

*

হয়তো কেদার-বদরী পায় জল-ধ্বনি
যার জ্যোতি তামিস্রতা হতে
সৃষ্টির একটি ক্ষীণ সলিলের স্রোতে

'এ মাহ বাদর'-গীতি বৈদেহী আত্মায়।
হট্র জল পূর্ণ শূন্য মন্দির কী অট্টহাস পায়!

কালপুরুষের দ্বৈত আকাশের বৃত্ত আকর্ষণে
শব্দ ধ্বন্যান্তরে গিয়ে করুণ কোমল হয় মনে॥

বিশিখ ভুবন

মাটি আকাশের ইশারায়
জানি আমি বেশ কি হারায়
জলের শ্বাস যে মেঘকায়া।
আকাশ মাটির ইশারায়
জামি আমি কী বেশ হারায়
মেঘকায়া যা চায় ছায়া॥

মেঘদূত

সব জল চোখ হয়ে যায়
সবুজ চোখের মমতায়॥

জলধির থেকে উঠে বেঁকে
জল তীর দূরদেশে চলে
দিয়ে যান কালিদাস এঁকে—
নগরের কত কথা বলে
আমি কালিদাস কি তা বলে?

গৌড়

নাগলোকে 'শেষ' নাম নিয়ে কাড়াকাড়ি!
অনন্তনাগের নাম কেউ পেতে চায়—
কেউ চায় শেষ হয়ে যেতে।
হর্ষচরিতের 'শেষ'-শব্দ বলে যান 'বাণভট্ট' তাড়াতাড়ি।
গৌড়ী-রীতি তাকে যেন ফোলায় ফাঁপায়।
অনন্ত উঠেছে আজ সংবর্তে বুঝি বা খুব মেতে,
আসলে সে 'ধরাসন্ধি' ভঙ্গিতে ভাসায়।
পৃথিবীর রত্ন সারি-সারি তার ক্ষেতে।
'পৃথুল ফণায়' 'ফুল্ল' করে লক্ষ বিস্তারে ফাঁপায়
শ্লেষের ভাষায়।

অলঙ্কার

শুনছি ময়ূর-ডাক কেকা
(অশোক ফুটেছে বুঝি একা?)
সঙ্গী সারস-ঝংকার

সকলি তো গলালঙ্কার
পিপাসা মেটানো একা-একা।
তারা কি ধারার জল খায়
মেঘে যার ছায়া ঝলকায়
তারি মোহে কলরব চায়।

*

এ তিনের বর্ণ মিলে যা-ই হয় আমি তা-ই নিয়ে
তোমাকে বানিয়ে
চলেছি প্রথম দিন থেকে
ফুল হও, জল হও আলো হও যাই আমি রেখে।
চোখের জলেই নম্র ধ্বনি-নর্মদায় চলে যাক তারা বেঁকে

অনন্তা

ভোর থেকে যাওয়া সন্ধ্যায় ফের সন্ধ্যা থেকেই ভোরে
নীলের দোলা কি আমাকে নিয়েই ঘোরে?
তোমারো রাত্রি নেই
পাই রাতভর সেই অনন্তাকেই।

প্রতিবিম্ব

তুমি যে আসবে ফিরে জানি।
তোমার প্রথম আলো খুঁজে নিতে পুরোনো জোৎস্নায়!
হয়তো ফুরোনো দিন-রাত্রির সে হানি
মনে আনব না কেউ, তবু চোখ ছবি নিয়ে যায়
যেন অবিকল কোনো বিকেলের রহস্যে উন্মীল
হাওয়ার সুরভি-ভবা আকাশের নীল
মেখে নিতে দুটি পথে, অন্ধকারে মুছে দিতে শেষে।

যে উচ্ছ্রিতা নেই আজ জানবে না কে সে,
তোমার মলিন আলো থেকে।
জানব না কে কে
অন্ধ কুয়াশার ছায়া ছিল শীর্ণ শীতে
দু-জনেরই উজ্জ্বলতা ম্লান করে দিতে॥

জন্মদিনের কবিতা

রোগের রোদন শুনি আবহমানের পথে-পথে।
জানিনে আহ্বান করে মন

কোন্ বৃক্ষ কী ওষধি যার দেহ জীবন-শপথে
পূর্ণ তাই চায় নিষ্পেষণ।
কোথায় বিশল্য আর কোথায় বা চক্র পাব আমি
মর্ত্য ছেড়ে স্বর্গে যাই পাতালেও নামি
রোদন-রতির স্মৃতি নিয়ে।
আকাশের বাঁকা চোখে কাঁদে আলো ইনিয়ে-বিনিয়ে
পাইনে সে সুদর্শন অথবা লাবণ্য কোনো অঙ্কুরের শ্যামল আভায়,
আমারে কেবলি নিচে ভূগর্ভে নাবায়
মণির খনির অন্ধকার।

অন্ধকারে জোনাকিরা জ্বলে।
যেন লতাগুল্মেগাছে তারামাছ রাত্রির অতলে।
জোনাকিরা আলো নয় নক্ষত্রের সূর্যের মতন,
জীবন, আঁচল-ঢাকা দীপ, তবু আগুনেরই জ্বলা আর নেভা,
আছে ম্লান তরঙ্গিত উত্থান-পতন
তাও ছন্দ হয়, দেয় সংগীতের সেবা
ক্লান্ত স্নায়ুতন্ত্রীরে বুঝি বা।
বিবিদ্যুত গৃহকোণে যারা রম্ভানিভা
বুঝি বা আরম্ভ করে নৃত্য কোনো রজনীর অন্তিম প্রহরে।
আমার ইটের ঘরে
শ্রুতির অতীত শত তারার গুঞ্জন
ত্রিযামা-জীবন-ব্যাপী করেছি ভুঞ্জন
মুছে ফেলে অশ্রুজল বিস্মিত নীরব-হাসি মেখে চোখে-মুখে।

তাই ভবিষ্যৎময় আজ এক অতীত কৌতুকে
তোমারে শোনাই, নারী, গান
তোমার হৃদয়ে প্রতিধ্বনি পাওয়া ভিষকের ভীষণ সম্মান॥

যাত্রা

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত শ্রদ্ধাস্পদেষু

বাষ্পযানে জ্বলে চোখ, অন্ধকারে বাঘের ব্যগ্রতা,
মুহূর্ত কাঁপছে যেন জীবন-মরণে একাগ্রতা।
কথাও ফুরোলো যদি, চালকের পদপাতে রথ
দ্রুতগতি কাল-মুখে। অট্টালিকা হেলে দেয় পথ,
সহস্র রহস্যদ্যুতি হিংস্র চোখ ঠেলে অনিবার
অন্ধকার সঙ্গী হয়ে ধুলো-ধ্বনি তুলছে শিবার।

রজনীরন্ধ্র তমসবন্ধ
বিকীরিত তারা হবে কি অন্ধ
উচ্চহাস্যে চক্রলাস্যে তিমিরা?
শার্দূলদোলে বিক্রীড়া তোলে
ভোলে মহাকাশ দৃষ্টি নিতলে,
লুব্ধতা-ক্ষণে লব্ধতা-মনে শ্রীমীরা।
বর্ষে আলোক সংগীতি-চোখ
পুষ্পপর্ণ যেন নির্মোক
গলে মহাকাল পাষাণবন্ধ—
ভূজঙ্গ বেশে শেষাপিনদ্ধ সিতারা।
গৃহ-গুম্ফায় যার ঘুম পায়
সেও উজ্জ্বল অনুকম্পায়,
আকাশ চলছে ভাবে শম্পাতী চিতারা।

বহুদিন আগে, মনে পড়ে,
এ-রাত্রি তোমার ছিল, মিতা,
তুমি তাকে উড়িয়েছ ঝড়ে
বুকে নিয়ে চিতা।

সে আগুন কার চোখে আজ
তোমার মনের অধিরাজ
খুঁজে পায় দেখেছ কি তুমি
হয়ে মরুভূমি?

...

লোকালয় গজভুক্ত। এখন ছায়ার গাছ সারি
গঙ্গার পুলিনে গাঁথা বালুভিতে গয়না, সুপারি
নারিকেল, কলা, ঝাউ, শৌখিন উদ্যানময় প্রেত।
সেখানে বাষ্পীয় যান থেমে গেছে, থামার সঙ্কেত
ইতস্তত কাদামাটি দিয়ে গড়ে মাটির মোহর
ইতিহাস : অতীতের চৌহাজারী বছুরে শহর।
আজকের অভিমান মনোরথ ক্ষিপ্রতাকে নিয়ে
অনাদি ক্ষপার দিকে, আনবে কি কথিকা ছিনিয়ে
নিজেই জানে না, দিক্-চক্র-গজ সব গুঁড়ো ছায়া,
বলয়ে দাঁড়িয়ে আছে বসন্তের দূতীর অকায়া।

...

খোলো খোঁপা খোলো বেণী-চুল
আমি তো করিনি তবে ভুল দেখব দেখাও,

তোমার গলায় সাপে দাগ
কাটলে কেতকী-অনুরাগ   আমায় শেখাও।
দিশা কি পেয়েছ কোনোদিন,
বাহুতে সাঁতার-দূরবীন   এনেছ কি দেখি?
তারপর কর এই পণ :
ভাঙবে না গীতা-আয়োজন   হবে না বিদেহী!

...

পথের শপথের সময়-দিক্-দেশ নয় তো ধু-ধু
বলয়ে শুনবে না যদি-বা তার সুর প্রলয় শুধু।
কাঁকন-ঝংকার শুনবে তবে দাও নৃত্য-তাল
আমিও জানি হতে ধরণী-কম্পিতা তালমাতাল।
পাতালে সঞ্চিত মনে হীরা যদি কান্না হয়
কোথায় কথাকলি ফুটবে তবে আর হৃদয়ময়?

দ্রুতযান শ্লথগতি। কী মন্ত্র মন্থর ভুরু-পাশে
জানে না ব্যাঘ্রের চোখ শুধু তন্দ্রা ছন্নতা-বিলাসে
যেন বহুভুক্তি শেষে রক্ত-মেদে-বিষে মিশে সুধা।
একান্ত কুটুম্ব হয়ে পশে ধীরে-ধীরে যে বসুধা
তারও নেই জ্ঞাতি। একে-একে সব অরণ্যের সাধ
আচ্ছন্ন জলের রেখা হয়ে তোলে তৃষ্ণার নিখাদ :
দুই নীর না কি দুই-তীর বাঁধা একটিই নদী
মনের গহন থেকে ঢালে জল মরণ-অবধি?
জল, জল। পথ নেই তেল ফিরে যেন তিলফুল
ধূসরাভ রাত্রিময়, সূর্যে শ্বেতকৃষ্ণে সমাকুল।

যোজনের স্বপ্ন মুছে অবতীর্ণ এখানে দু-জন
নীলকণ্ঠ পাখি ডাকে, আয়োজিত আকাশ-কূজন॥

লেকের সন্ধ্যায়

একটি নদীকে পথে মরু পেয়ে মরে যেতে দেখেছি যখন
ভাবিনি তোমাকে—সেই তোমাকে আবার পাবে মন
এখানে লেকের কাছে।
বাতি জ্বলে নগরের, রাত্রি জ্বলে আশে-পাশে কাছে
ধরে থাকে পাতা-ফলে জলো আলো বাতাসের মুখেও আড়ালে।

কোথায় বা ছিলে আর কেন বা দাঁড়ালে
হঠাৎ ঘাসের থেকে হাঁসের গ্রীবায় উঁচু ছায়া হয়ে, চোখে
শুষে পেছনের দিন, তামার আলোকে
শরীরের সব কালো ঢেকে!

তোমাকে সজল রেখে
যাব না যে সেই ভয়ে নেভে কাকবাসাতে গাছের
সবুজাভা, তবু ভাবি এখানেই শুরু
তোমার প্রথম কথা, আমার শেষের দুরুদুরু!

পাওনা ছুটি

স্বপ্নে নয় কোনো এক ছুটিতে পাব কি
হরিণের বন আমলকী
পাহাড়ের ঢালুতে গড়ানো।
কাছে জলা পদ্মগন্ধ গায়ে মেখে থাকে,
দূরের ওপার হতে ঝাউয়ের গানও
এসে শিরশির করে ঢেউ দেবে বুকে।

মোটের উপর বটগাছের যৌতুকে
সে-দেশ সবুজ নয়, ডুমুরের কচি মুখ আঁকে
অনেক পুরোনো দিন অনেক পুরোনো ফলশ্রুতি,
সেখানে কপোত-ভোর দ্বারে-দ্বারে জাগার আকুতি
দিয়ে দুপুরের ঘুঘু-নিদালি ছড়ায়।

যে দূর-স্থানের কাল সুদূর জড়ায়
তার কাছে ছুটি-মনে খানিক সময়
ধার নিতে পারবে কি সময়ের বহু অপচয়?

তুমি আমি সেইখানে—
(তুমি ছাড়া সে ছুটির নেই কোনো মানে)
হয়তো গেলাম, পথে রাত্রি হয়ে গেল ;
'সকলি গরল ভেল'
মনে-মনে বলবে হৃদয়
জ্যোৎস্না আর হাওয়া যদি লেবুফুলে গন্ধ মেখে রয়
মনে হবে—সে হাওয়া কি আমাদের মন—
যে-মন প্রথম জাগা সাপলার বন?

চোখ

এ চোখ দিয়েছে বহু দৃষ্টি মৃদু করুণ কোমল
নিয়েছে হয়তো শুষে অনেক চোখের লোনা জল
হয়তো তা অপরাধ হৃদয়ের কাছে।
হৃদয়ে তোমার স্মৃতি আছে
তবু অপরাধ করে যায় এই চোখ।
তুমি কি বলবে তাকে তবে অন্ধ হোক?

সুপর্ণাকে

নরকাগ্নি থেকে আমি আসি,
এখনো তোমাকে ভালোবাসি
সুপর্ণা আমার—
তোমার মুখের নীল স্নিগ্ধ অন্ধকার
সে আগুনে নীলও
তাই যেন অপূর্ব, শীতল।
আগুন নেবালে তুমি চোখে এনে জল।

রোগশয্যায়

দেখা দিলে চাঁদ
আমি বুঝি এখনো উন্মাদ
তোমাকে ছিনিয়ে নিতে পারি আমি এখনো তেমন
এ চাঁদের নিচে।

দু-হাতে ঢেকেছ তুমি স্তন,
আমি পিছে-পিছে,
এ ছবির উম্মাদনা পাই!
পেতে শুধু এক খণ্ড আকাশের সোনা চাঁদ চাই।

শুধু ছবি দেখা!
বিছানায় শুয়ে একা-একা—
শুধু মনে-মনে ভাবা ছবি।

কানে শুনি সন্ধ্যার পূরবী,
মন মাত্র কামনায় জ্বলে,
জ্বালায় হয়তো চাঁদ তার মায়াচ্ছলে।

জর্নাল

বৈশাখ

রক্ত

রক্তের বিশাল পরমায়ু বন্দী কয়েকটি প্রহরে।
পৃথিবীর ধাতুপাত্রে ঘন্টা বেজে যায়,
আলো আর অন্ধকারে ঢেউ তোলে শব্দের শরীর।
সময়ের সে-যন্ত্রণা সমুদ্রের মতো সিক্ত করে দেয় তীর
যেখানে দাঁড়াই এসে জীবনের ক্ষিপ্র হাত ধরে
রক্তের প্রার্থনা শুনি সে যে মুক্তি চায়।
রক্ত চির-আকাশের জ্যোতিচ্ছায়া নদী—
অন্ধকার কূল ভেঙে পায় অন্ধকার নিরবধি॥

আবিষ্কার

বসন্ত-রাঙা নির্জন এক পথে
দেখছি আমার রক্তের ছবি আঁকা।
মনে হল যেন আমি হিম-পর্বতে
পড়ে আছি মৃত তুষারের প্রেমে ঢাকা॥

জানালায়

ছাই-রঙ আকাশ-ছায়াতে
ছিটে-ফোঁটা আলো, গাছ, কংক্রিটের বাড়ি
অলৌকিক সব।
কাল ভোরে আর যেন ঝুলবে না শাড়ি,
কালো মেয়েটিও আর দাঁড়াবে না ছাতে
মুখে রাত্রি মেখে।
আমি জানালায় রোজ যাব শুধু দেখে
পুড়ছে রাত্রির অবয়ব॥

রাজকন্যা

তোমার মুখের ভোর মনে পড়ে যখন ঘুমনো ছিলে—
তোমার মুখের ভালোবাসা ছিল আকাশ-রাঙানো নীলে।

তোমাকে জাগাব সাধ্য ছিল না, সোনার রুপোর কাঠি
কোথায় পেতাম, তা-ই খুঁজে আজো তেপান্তরেই হাঁটি॥
জ্যৈষ্ঠ

বিষণ্ণ রোদে

বর্ষার বিষণ্ণ রোদে বাড়িঘর প্রৌঢ় হয়ে গেছে
আমার মতন।
আমি তুলে নিই বেছে-বেছে
ক্লান্ত পায়ে ওখানে যে কারা কাজ করে।
তাদের অনীহা-ভরা মন
ছোঁয়াচ লাগায় মনে, বসে থাকি ঘরে।

রুগ্‌ণ বুকে কী আলস্য বাসা বাঁধে আজ—
মেঘে-রৌদ্রে চেয়ে থাকি, তার কারুকাজ
আমাকে ভাবায় শান্ত জীবন-মরণ—।
কবে তুমি, কন্যা, সব ভেঙে দিয়ে পণ
আমাকে ভাসাও—
অনির্দেশে, সেই অনির্দেশে তুমি আজো নিয়ে যাও!

আষাঢ়

আষাঢ় এল

যেন ম্লান পৌষ এই প্রাবৃষের ভোরের আষাঢ়।
প্রাকৃত ভাষার
কবিতাটি মনে পড়ে আজ—

সো মহ কন্তা
দূর দিগন্তা
পাউস আএ
ঢেউ চলাএ

হাত থেকে পড়ে যায় হাতে-তোলা কাজ॥

পঞ্চমী

মেঘের কাদায় লেপা পশ্চিম আকাশ।
সোনালি-রুপোলি জলে উপরে কে চাঁদ আঁকে তার!
পঞ্চমীর যেন পূর্বাভাস
অন্য এক আকাশের, সাদা মেঘ কারুকাজ যার॥

অম্বুবাচী

জলো হাওয়ার মতোই যেন এলোমেলো ফুল
আমার চোখে এল—

আষাঢ় মাসে এ কী আমার চৈত্র-রাঙা ভুল!
সে ভুল মাটি পেল?

শ্রাবণ

পাপীয়সী

পৃথিবীর মতো তুমি পাপীয়সী, তাই ভালোবাসা
পেয়েছ আমার।
সে তোমার শুধু অন্ধকার
যে আমার প্রলোভন, পশু সর্বনাশা।
সব জানি, মানি সব, তবু ভালোবাসি।
তুমি ডাক দিলে পথে হেসে ফিরে আসি॥

ভাদ্র

ভোর

চন্দ্রচূড় নীলাকাশ মেঘ-জটা মাথার উপর:
বাঃ কী সুন্দর ভোর হল।
ঘুমে তুমি ছিলে তো কাতর আর এই
ঘুম-জাগানিয়া ভোরে হলে ছলোছলো
পার্বতীর মতো, তবু অকাল বসন্ত আর নেই
আছে শুধু দেয়ালের ঘর॥

বাতাসে

মাছের মতন সব গাছের পাতারা
খেলা করে বাতাসের জলে।
আজ মনে-হৃদয়ে যে সাড়া
পাতা-নড়া অশ্রুর উজ্জ্বলে
অজস্র চোখের
সে-কান্নার হাসি ঢের-ঢের॥

আশ্বিন

স্মৃতি

এখন সে দেবদারু বড় হয়ে গেছে,
মঠের মতন।
ডালগুলো নেই বারান্দায়,
পাতার মতন তাই কে আর তাকায়
রাস্তার ওপারে ট্রাম-স্টপে!
ট্রাম চলে রাতদিন, বাড়িও দিয়েছে কেউ বেচে,

হঠাৎ এখানে থেমে মন
তাই বুঝি ভস্ম নাম জপে॥

আহিরীপুকরে

এখানেও যাওয়া যায় ঠিক তত দূরে—
বাস থেকে নেমে ছোট আহিরীপুকুরে।
আহিরিণী নেই, তবু আছে বট-খেজুর-বাদাম
মনে পড়ে যেতে পারে টুপটাপ নাম
সবুজ-হলুদ-লাল। চোখ গেলে জলে
দেখা যাবে সাদা করবীর ঢের ফুল
মুখ দেখে, দেখায়ও, পাতা-কাটা চুল।
এখনো একটি হাঁস জল ভেঙে চলে॥

কার্তিক

প্রতীক্ষায়

শ্বেত স্থলপদ্ম ফুটে আছে পাশের বাগানে।
সকালের সাদা আঁচ লেগেছে—কার্তিকের
কুয়াশায় আধবোজা সকাল।
বস্তির নিত্যকার ঝগড়ায় রেশ শুনছি।
তোমার সঙ্গে কি আমার ঝগড়া হয়েছিল?
সেই যে গেলে আর এলে না। আমার হৃদয়ের
সব রঙ যে সাদা হয়ে গেল! এই হেমন্তে
গুলঞ্চের মতো একটু হলুদ বুকে ধরে
রেখেছি তোমার গায়ে মাখাব বলে।
তুমি কি আসবে!

রোমান

উঠোনের মতো ছোট ন্যাড়া মাঠে ছোট টালি-ঘর।
দেখি এক কণা গেঁয়ো সেকেলে শহর।
বউটি কে আনলে এখানে—
উঠোনে উদোম গায়ে আসে বাবে-বারে,
এটা-ওটা করে :
কখনো কাপড় কাচে শানে,
শুকোয় চিকনো মোটা খুঁটি-বাঁধা তারে,
শুনিনে হয়তো গুনগুন গানও ধরে ;
কখনো বা এক ঝাঁক বাসন ঝিকিয়ে তুলে মাজে!
রাত্রির কি উজ্জ্বলতা ছড়ায় সে কাজে।

অগ্রহায়ণ

কাছাকাছি

আমি আর চাঁদ মুখোমুখি চেয়ে আছি।
ভোরের চন্দ্রে রন্ধ্রগুলোও নীল
আকাশের মতো খুলেছে দূরের খিল—
চন্দন-আলো দেখে তার শুধু বাঁচি।
দূরকে সয় না আর
কাছাকাছি সব আজ ভালো লাগে মনে
ভাবি বসে আছি এখন তোমারি সনে
ঘুচে গেছে সব দূরের অন্ধকার ॥

পৌষ

পৌষের রাত্রিতে

পৌষের রাত্রির অন্ধকারে
মনে পড়ে তারে :
কালো মেয়ে, বিবসনা এলোচুলে দাঁড়িয়েছে বুঝি।
আমি তার অন্ধকারে খুঁজি
আমার ভয়ের গূঢ় বাসা।
তাকে ভালোবাসা
ক্ষয়ে যায় হৃদয়ে যেন বা।
মনে হয় পাই যদি একমুঠো জবা
তার পায়ে ঢেলে দিয়ে পাই বুঝি ত্রাণ—
এমনি সে কালো মেয়ে অন্ধকারে যার মন-প্রাণ
শরীর মিশানো।
হে হৃদয়, তুমি জানো
কত দীর্ঘ দিন গেল সে ভালোবাসায়
সে ভালোবাসায় ভয় মুক্ত ডানা পায় ॥

পৌষের ভোরে

যেন এক দুর্যোগের রাত
ভোর হয়ে বাড়াল দু-হাত
মুঠোভরা আকাশের আলো নিয়ে তার।
নম্র সূর্যে দিন এল এ কী চমৎকার!
ভাববো তোমাকে সারা দিন,
কালো মেয়ে, ভয় ব্যথাহীন!

মাঘ

গান্ধীজির প্রস্তরমূর্তি

একটি নিঃসঙ্গ পদাতিক
চেয়ে আছে চৌরঙ্গীর দিকে,
হেঁটে যায় যেই পথে, নেই ফুল, আছে শুধু কাঁটা।

মোড়ে লাল আলো দেখে গাড়িগুলো থামে এসে ঠিক—
দেখি সেখানের আলো আঁধারেতে ফিকে
গাড়ির মিথুন দেখে ফেরিঅলা কেউ
রজনীগন্ধার সাথে ডাঁটা।

মুহূর্তে আমার চোখে খেলে ডাণ্ডি-সমুদ্রের ঢেউ ॥

ফাল্গুন

কুসুমিত

হৃদয় বসন্ত হয়ে আছে
তার গাছে-গাছে
কচি পাতা লাল ফুল ভ্রমরের সাড়া
রাত্রিভরা তারা
বহুদূর নিয়ে আসে কাছে।
যুগে-যুগে তপোভঙ্গ করেছ যে সেই ইতিহাস
বয় আজ সুরভিত আমার নিঃশ্বাস ॥

চৈত্র

সহমৃত

সুন্দরী তারার সঙ্গে আকাশের চিতা
জ্বালায় সন্ধ্যার সূর্য আজ।
পশ্চিমে কোথায় কে যে অগ্নিকুণ্ডে হয় সহমৃতা
সুন্দরী তারার নিয়ে সাজ—
তাই নিয়ে হৃদয়ের ব্যথা।
কেউ কারো মৃত্যু আনে ; জানিনে যে কে তা—
শুধু জানি আমি কারো মৃত্যু নিয়ে আজ মৃতপ্রাণ-
সহমৃত তারার সমান ॥

গোপীযন্ত্র

স্নায়ুতন্ত্রী বাজে নানা সুরে
ফোটায় অনেক ছবি নিকটে ও দূরে
মনে হয় গোপীযন্ত্র আমি—
আমিই বাজাই, আমি স্নায়ুধর স্বামী।
আমিই ফোটাই ছবি আমাকেই নিয়ে
স্ত্রী-শরীরে, করি তাকে বিয়ে
ঘর করি, সুখে থাকি ভারি।
গানের সুরের শুনি পদ-কলি তারি॥

স্মৃতি

আমার নির্জন রাত্রি হাওয়ায় মুখর।
আমি যেন পাই তার স্বর
যে এমন বসন্তের দিনে
এসেছিল দিতে তার মন—
মনের নিঃস্বন
নিল কি এ হাওয়া আজ চিনে?
বিনিদ্র বসন্ত যায় স্মৃতির প্রলাপে
যেখানে সে ছুঁয়ে গেছে সেই ঠোঁট সেই বুক কাঁপে॥

স্নাত

তোমার স্নানের গায়ে দুপুরের একটি পুকুর
বুকে যার সাদা হাঁস ভাসে।
সাপলার গন্ধ পাই তোমার নিঃশ্বাসে
জামরুল গাছে ঘুঘু-সুর
শুনব যেন বা ঠোঁটে যদি কথা ফোটে।
হাওয়ায় সবুজ ভাঁজ ওঠে
জলরঙ শরীরের আনাচে-কানাচে
যদিও জানিনে আজ সে পুকুর আছে কি না আছে॥

কুয়াশায়

আজ ভোরে বাড়িঘর কুয়াশায় নিয়েছে কবর,
পৃথিবী মৃতের স্থান মনে হয় তাই,

কিম্বা রোগী হাসপাতালের সাদা সিক্ত বিছানায়।
আমার মনের প্রান্তে মৃত কথা মৃত ছবিগুলি
এনে দেয় বুলিয়ে কে সাদা-রঙ তুলি!
তার হাতে হায়
নবতন কিছু নেই পুরাতন স্পর্শ শুধু পাই,
আর্ততায় এ হৃদয় কাঁপে থরথর!

ভয়ের শরীর
আমার হৃদয়ে করে ভিড়
মৃত পৃথিবীর কথা আনে।
জানে মন জানে
অমৃতের পুত্র নেই কেউ,
শুধু মৃত্যু ঢেউ ভাঙে আর তোলে ঢেউ॥

নদীর মতো

ভোর।
আমার চারিদিকে ভিজে করগেটেড টিনের চালা ছুঁয়ে
উনুনের মিহি ধোঁয়া উড়ছে।
আমি যেন এক বাষ্পঘরে আছি। রোগী।

রোগের মৃদু যন্ত্রণা আনন্দের মতো এই শীতল ভোরে
আমাকে আচ্ছন্ন করল!
তোমাকে যদি একটি ডাকে চৈত্র-ভোরে জাগাতে
পারতাম!

তুমি নেই অনেক দিন হয়ে গেল।
ভুলে-যাওয়া এক নদীর মতো তোমাকে আজ মনে পড়ে-
যে-নদীর তীরে বসেছিলাম!

এখন এই শীতলতায় আমি আবার সেই নদীর সময়
গুনছি।

জীবন-মৃত্যু

কপাটে আমার
হাওয়া নয়, তোমার আত্মার করাঘাত
বাইরে নয় তো অন্ধকার
আমার অতীত যেন ছিল সারা রাত।
কী দুর্জয় ভয়ে, মৃতা, কেঁপে উঠেছিল এই বুক!
তোমার মৃত্যুর দিন হতে
আমার এ আত্মার অসুখ।
দিন যায় জীবনের স্রোতে
সারা রাত মৃত্যু নিয়ে থাকি
বিনিদ্র, হঠাৎ ডেকে ওঠে ভস্ম হতে ভোর, পাখি।

ডাক

একটি পাহাড় ডাকে, ধূসর পাহাড়
দূর থেকে, না কি এই হৃদয়ের থেকে!
পাথরেব হাড়
উঠেছে শরীরে তার যেন এঁকেবেঁকে!
তাই আমি বসন্ত-বর্ষায়
পারিনে ফোটাতে ফুল, তারা চলে যায়
বিস্মৃত অতিথি!
পাহাড়ের হাড় ডাকে, তাই বনবীথি
ইশারা আনে না ইতস্তত।
আমি বদ্ধ শিলাযুগে, সময় নিহত॥

রাত্রি

রাত্রির আকাশ যেন তারার ফোয়ারা।
হৃদয়ে কে ডেকে-ডেকে সারা
পায় না উত্তর।
এ রাত্রি আমার স্বয়ম্বর।

রাত্রি ভালোবাসি ভ্রূণ-অন্ধকার হতে
রক্ত কালো স্রোতে
আমাকে পাড়ায় ঘুম স্বপ্নের আলোতে।
আমার তারারা নিদ্রালসে ধু-ধু নীল
রৌদ্রকরোজ্জ্বল আছে সে কোন্ নিখিল!

দর্পণ

পুকুর শিল্পীর পট গাছের ছায়ারা আছে মেলামেশা করে
আমি যাই ভোরে
দৃষ্টিস্নান করে ঘরে ফিরি।
পবিত্র ভোরের মতো মনে হয় হৃদয়ের সিঁড়ি
তা বেয়ে অক্ষয় স্বর্গবাস।
গত দিনরাত্রিময় মলিন নিঃশ্বাস
মুছে দিয়ে এই মাটি এই ঘাস পাই অন্য নামে
পুকুরের মতো যেন আত্মার বিশ্রামে
উত্তপ্ত দুপুর কেটে যায়
চোখে স্বপ্ন ছায়ায়-ছায়ায়॥

সম্ভোগ

তারা-ভরা আকাশের তলে
আত্মা আজ দাঁড়ায় একাকী
স্তব্ধ হয়ে গেছে সব পাখি
পৃথিবীও অন্ধকার জলে
চিহ্নহীন, প্রাংশু আত্মা শুধু
স্তম্ভের মতন আর সবি ছায়া ধু-ধু
যেন প্রেতচ্ছবি।
নক্ষত্রের আলোর সুরভি
পেয়েছে আমার আত্মা তার সত্তাময়
তাই তার অপূর্ব উদয়
তাই রাত্রি সম্মোহিত নারী
আমি বুঝি আজ তাকে বুকে নিতে পারি।

নিঃসময়ে

মেঘ-সন্ধ্যা আর আমি আকাশের নিচে।
দিনের সকল আলো মিছে
মনে হয়, মনে হয় সত্য অন্ধকার
আমি যেন ভ্রূণে ফিরে গিয়েছি আবার
সময়ের দাগ মুছে ফেলে।
এ সময় নিঃসময় তার কোলে এলে
জন্মমৃত্যু নেই
আমি আকাশেই
একটি ধূসর রেখা, এই পৃথিবীর
ফুরিয়েছে লেন-দেন পৃথুল শরীর॥

ট্রেন

দূরে ট্রেন যায়, হায়, এ মাটিতে আমার শিকড়
এই গাছপালা, বাড়িঘর
একটানা সন্ধ্যা ভোর অচল করেছে দেহমন
এখানের যত আয়োজন
শুধু স্থির রেখে যেতে চায়।
বার্ধক্যের এই অবেলায়
তবু আমি চেয়ে থাকি যেন কোনো ট্রেন
আমাকে ডাকবে নিয়ে যেতে
এ খামার-ক্ষেতে
ফুরাবে আমার লেন-দেন॥

শতাব্দীর অপরাহ্নে

শতাব্দীর অপরাহ্নে মন,
হৃদয়, সময় যেন চুপ করে আছে।
উর্বর পৃথিবী, তবু যেন তার কাছে
কিছু আর পাব না এখন।

ভালোবাসা ভয় হয় রক্তের ভেতর,
স্মৃতি বিস্মৃতিতে গিয়ে মেশে,
পরিচিত সব কণ্ঠস্বর
উধাও যেন বা নিরুদ্দেশে
মৃত্যুর গহনে।
শুধু মৃত্যু ঝরে পড়ে মনে।
যে-মন মৃত্যুরই মতো চুপ।
আমি এই শতাব্দীর অপরাহ্ণ, অন্তিম, অরূপ।

সাম বিচ্ছুরণ

তারার মেখলা খোল, দেখি রিক্তা তোমাকে ক্রন্দসী,
অজন্তার কৃষ্ণা বিষণ্ণতা কেন মুকুটকেয়ূরে।
দাও যদি দূর হতে ধ্বনি বিম্বাধরে তবে সুরে
ওষ্ঠও কাঁপুক, বল নিরাবরণের দৈন্যে, মৃধ্রবাক্ কথা
জড়াক আহ্লাদ জিবে শুনি সরলতা :

'ভালোবাসি'— অক্ষয় বেদনা! তবু দূর হবে হৃদয়ের মসী।
তখন আকাশে আর রাত্রি নেই, রূপসী উষসী মোছে জলে
সপ্তগ্রামে আলো গুলে। কৃষ্ণা কী অপূর্বারুণ—উষা!
ঘর্ঘরার ঘাগরিতে গার্গীর মতন অনাবৃত উর্ধ্ব, নাগ বেশভূষা,
যমুনার জলপ্রভা লোহিতে মিশিয়ে গাই দ্বৈপায়নী সাম।
সব গ্রাম জেগে ওঠে মৈনস সিন্ধুর থেকে লোহিত সিন্ধুর দেশে পায়
উর্বশীর ছোট-ছোট উষা নাম।
অনিরুদ্ধ সেই স্বর ধ্বনিতে অম্বরে, কৃষ্ণা মাটির আঁচলে॥

স্বভাব ধ্রুপদ

মেঘলা আকাশের অন্ধকার তুমি মগ্নচেতনার চিত্রকর
অতীত কত দূর মনের গুহাবাসে! অচেনা মনে হয় সব প্রহর!
দুপুর নয় যেন দুপুর আর, কোনো লুপ্ত জগতের অন্ধকার।
দেয়ালে ছায়া নেই গুহার ছায়াগুলো উধাও ভেঙে দিয়ে সব দুয়ার।
গুহার মুখ থেকে কোথায় গেছে পথ সে কোন্ উদ্যানে যাত্রা শেষ

সেখানে আঁকবে কি বৃষ্টিধারাজলে চিত্র নাকি হবে নিরুদ্দেশ
শূন্য উদ্যানে, বিলীন বাবিলন! লজ্জমান যদি স্বর্গবাস,
প্রেয়সী বিদ্যুৎ কী দিল পথাভাস শুধুই সর্পবেণীর পাশ?
মেঘলা আকাশের অন্ধকার, তুমি সুদূর সন্ধ্যার সিন্ধুতীর—
সূর্য ডোবে একা, মগ্ন আমি একা উতল রাত্রির মাতৃনীর।

প্রাচীর প্রাচীন সাম

পূর্বাশার আসে আলো
কান্ত কম ভেদি অন্ধকার
মর্ত্যলোক পুনঃ পায়
আশীর্বাণী সূর্যদুহিতার।
চিত্রা যায় উষসীর অগ্রে
যেন বেদিপার্শ্বে যূপ।
শুদ্ধা হয় তামসীর
কৃষ্ণা কায়া হেরি অগ্নিরূপ!

উষসী উর্বশী, ছিলে কোন্ চৈত্রে চিতা যে জ্বালিয়ে
প্রাক্‌জ্যোতিষের অনিরুদ্ধ রুদ্ধশ্বাস দেখে এলোকেশী নাগিনী কালীয়ে।
তামসী বালিকা জানি সে উষার চোখের বালি যে—
তমালিকা সব।
অশোক-পলাশ রক্তে বিগত-সৌরভ।
বনে ভ্রাম্যমাণ পুরূরবা
ভীমপলাশীর কান্না দিবে পৃথিবীতে কাঁদে, কালো মেয়ে নেয় রক্ত, মাটি, রক্তজবা।

পুরূরবার কান্না

(ভীমপলাসী)

"মিলন-রাতি পোহাল সখি উথলি ওঠে আঁখিজল।
কমল-কোলে শিশির দোলে ফুরোলো প্রাণ-পরিমল।
আকাশে কাঁদে করুণ তারা
নিশির কালো আঁচল হারা,
বনের নীলে ভাসিল যেন ব্যাকুল ব্যথা ছলোচ্ছল।"

ফুলের বিষয়

(ভীমপলশ্রী)

ছুঁই, কামিনী ঝরে,
তুই আসবিনে তো ঘরে।
যুঁই, আসবি যে তুই জানি
ভুঁই-চাঁপায় কানাকানি
রানী বেলচামেলি মরে।

তারার গান

(ভীমপলশ্রী)

"ও সহেলি বল তুমি কোন্ পুবালি তারা?"
"আমি চাঁদের মিতা চিতা আমি তাইতো ছলোছলো!"
"তুমি আকাশ-পটে ছবি আমি কবি পাগল পারা।"
"আমি সাতাশ তারা চাঁদে সাততারের সিতারা।"

পৃথিবী

যাদের সূর্য আসেনি আকাশে, আনেনি দিন,
এই সূর্যের দিনগুলি জ্বালে যাদের চিতা—
পৃথিবী, তোমার রক্তে কি নেই তাদের ঋণ—
আঁচলে তাদের বাঁচায়ে হবে না শুচিস্মিতা?

ভুলেছ ফুলের আর ফসলের অশ্রুজল,
মাটিতে জমেছে ধূসর ধূলির পঙ্কিলতা—
পৃথিবী, তোমার যাত্রার পথ অনুজ্জ্বল—
মুছে ফেল স্মৃতি, ইতিহাস, যত ব্যথার কথা।

অন্ধ সূর্য অন্ধকারেই মৃত্যু চায়
এবার তোমার বন্ধন খোলো যা ছিল মনে,
নতুন সূর্য এসেছে সুদূর নীহারিকায়
ডাকে সে তোমারে তার অপরূপ আকর্ষণে।

সেই সূর্যের আকাশ বুঝি বা অনেক নীল.
অনেক আলোর প্রভাত, রাত্রি অনেক কালো—
পৃথিবী, তোমার দেহে যৌবন বিসর্পিল—
ভুলেছ যাদের তাদেরি কেবল বাসিবে ভালো॥

নতুন পত্র, আষাঢ় ১৩৪৬

তারা

মৃত্যু এল রাত্রির ছায়ায় :
সেই গন্ধকের ঝাঁঝ
আগুনের সেই ঝাঁঝ
যেমন নিশ্চল মৃত্যু আনে কাচপোকার পাখায় :
যেমন মৃত্যুর ঘ্রাণ শিশুদের ঘুমে,
ছায়া হয়ে ভেসে যায়
যেমন মেঘের মৃত্যু কোনোদিন সাহারায় সিসার আকাশে-
সেই সব মৃত্যুরা কখন
এসে গেছে রাত্রির ছায়ায়।

এখনো যাদের চোখে পৃথিবীর ভয়
শরীরে শবের স্মৃতি
পুড়ে-যাওয়া রক্তের অঙ্গার
তারা তো হাওয়ার কাল করেছিল ভিড় ; .
তাদের হিমের ভিড়ে
নিশ্বাসের ক্লান্ত ভিড়ে
রাত্রি ছিল একা।

অনেক দেহের হাড়
কোনো দীর্ঘ ধোঁয়াটে প্রান্তরে
পুঁতে গেছে ট্যাঙ্কের চাকায়
শ্যেলের চিতায় পোড়ে ছেঁড়া মাংস এখনো কোথায়!

বহুদূরে মৃত্যু রেখে
মৃতেরা কি এসেছিল এখানের সবুজ বাতাসে?
এখানে অনেক ফুল
নরম ঘাসের ঢেউ
মাটি বুঝি শীতল নিটোল।
তারা চেনে মেয়েদের চোখে আর শস্যে কোনো নিবিড় পৃথিবী
তার ঘ্রাণ নিয়েছে আবার
সেই স্বাদ নিয়ে গেছে তারা
দেখে গেছে রক্তমাংসে পৃথিবীর দীর্ঘ পরমায়ু।

নিরুক্ত, আশ্বিন ১৩৪৭

আবিরাবির্ম এধি—

সূর্যের পেছনে আছে যে-আকাশ তারি নীল চোখে এসে লাগে,
যে-জ্যোতি জ্বলিয়া যায় অসহ্য সে, এ চোখ অগাধ—
শ্বেত আকাশের তপ্ত হৃদ্‌পিণ্ডে জাগে
জানিনে কেমন সূর্য-স্বাদ।

স্নায়ুর পিপাসা চায় তবু যেন আশ্চর্য সূর্যের আবির্ভাব ;
আমাদের আয়ু তার উত্তাপ কুড়ায় অবশেষে
দিনের ভগ্নাংশ হতে বিগলিত স্রাব
যখন রাত্রির দেহে মেশে।

বিরাট পাখির মতো সেই রাত্রি—অন্ধকার নিশ্বাসের ফেনা ;
পলে-পলে সেও চায় মৃত্যুর অবাধ অবকাশ,
তার আত্মহত্যা তাই কেন লিখিবে না
তারি নখে তারার আকাশ!

জ্যোতির এ আমন্ত্রণ নেপথ্যের সময়েরে এনেছে সম্মুখে,
যদি বা সে-প্রতীক্ষায় তীক্ষ্ণ মন তৃণের মতন—
মন আর সময়ের মানুষের বুকে
দীর্ঘ ছায়া করে পর্যটন।

উদ্ধত শোণিত-কোষে সে ছায়া তো মানুষেরা চায়নি কখনো—
হিমালয়ে একদিন উচ্চারিত সেই অস্বীকার ;
তীব্র নেতি ইতিহাসে হয়ে আসে ঘন,
খোলে কেউ উষার দুয়ার।

দিন আর রাত্রি মিশে ভবিষ্যৎ শূন্যতায় গড়ে আরো দিন :
(বিষণ্ণ যখন দিন অশরীরী রাত্রির ছোঁয়াতে,
রাত্রির দুঃস্বপ্নে আসে আলোকের ঋণ,
বর্তমান মরে অপঘাতে।)

সেই দিন—সময়ের যে উজ্জ্বল খণ্ডে আর নেই নীহারিকা—
আসুক দিগন্তে নিয়ে দীপ্তির মসৃণ সম্মোহন,
যত সূর্য গেছে মরে তারই ভস্মটিকা
হোক তার তৃতীয় নয়ন॥

নিরুক্ত, আশ্বিন ১৩৪৮

'ত্রিপাদস্যামৃতম্'

(রবীন্দ্রনাথকে)

ক্লান্ত আয়তনে মেশে সময়ের দীর্ঘ ঢেউগুলি
জমে ওঠে বস্তুর অণুরা,
জাগে শুধু ছোট-ছোট চর
জাগে না আকাশে দীপ্ত বহ্নিমান চূড়া ;
জীবনের চিত্রকর
সেখানে দাঁড়ায়ে আছে হাতে নিয়ে বর্ণহীন তুলি।

কত ম্লান স্বপ্ন আর কত মৃদু আয়ুর নিঃশ্বাস!
মাঠের হেমন্ত অবসান,
শ্বেত ইস্পাতের স্ফীত দিন
জানে না যে ফুরায়েছে তার সব দান—
যা আছে কেবলি ঋণ
দিয়েছে বিস্মৃতপ্রায় উজ্জ্বল অতীত ইতিহাস।

সে নিরাভ দিন হতে তবু আসে নিবিড় আঘ্রাণ
ফুটেছে কোথায় শতদল
মেলে যার দল এক-একে!
সে দিনের অগোচর হাসি অশ্রুজল
নীরব প্রভাত থেকে
কয়টি ফুলের মতো পেয়েছিল মানুষের প্রাণ।

নিস্তরঙ্গ পৃথিবীর ঊর্ধ্বে যে আকাশ সূর্যময়
সীমাহীন তার চঞ্চলতা,
সে-মানুষ শোনে অবিরাম
স্তব্ধ তীর হতে দূর সমুদ্রের কথা :
কী এক অজানা নাম
যেন দিকে-দিকে বিচ্ছুরিত তবু আছে পরিচয়।

উদ্ভাসিত দীর্ঘ ছায়া আমাদের পটভূমিকায়
সেখানে কালের নীড় বাঁধা :
ক্ষিপ্ত আর সংক্ষিপ্ত সময়
তীক্ষ্ণ রেখা দিয়ে আঁকে কালো আর সাদা
ক্ষুধা তৃষ্ণা ব্যথা ভয়
জীবনের দেহে, তবু পেছনের আভা দেখা যায়।

আহত এ বর্তমান ; ভবিষ্যৎ নয়, জানি, ভীত :
আছে আরো অরণি, আগুন
তারি ধোঁয়া এখন বাতাসে ;
আছে আরো সূর্যময় মানুষের ভ্রূণ
একবার ইতিহাসে
যখন করেছে কেউ অধিকার অপ্রাপ্য অমৃত॥

চতুরঙ্গ, ৪র্থ বর্ষ, আশ্বিন ১৩৪৮

অগ্রতমিস্র

(মিশ্র ছন্দ)

রাত-অরণ্যে অরণি জ্বালায় কার চিতা
চিত্রা তারার অর্চনা শেষ, কে কবিতা
এখন আমার? সে কোন্ হরিণ হিরণরাশি,
নতুন শীতের সোনার আগুন হে সবিতা,
কোন্ গোরীরে পুড়িয়ে এলে, হে সন্ন্যাসী,
পেতে আকাশ-কন্যা আলোর বন্যা-রাশি?
কোন্ জলে উর্মিলা লীলা মন সবি তা
ভুলল, তোলে অঞ্জলি-হাত কংস-পীতা
কার মায়া, কোন্ বৈদেহিনী স্বর্ণসীতা
তমসা আর স্বাহায় প্রিয়া প্রাণ সঁপিতা।
এসো প্রাংশু হিমাংশু-মন পাংশু পিতা।

এবার আবার উষার আভায় এস পিতা
বুথির আভাস শমন-শনি স-উপবীতা
এস মধুর প্রদোষ ঈষৎ দিতির গীতা
অর্ধনারীশ্বরের বোধি সাঁচী স্মিতা।
ক্ষুমার উমার ওমে হে প্রাণ আর্ততম
এসো রাধার হরিদ্রাতে হৃদয়-কামা
হরিদ্রা-ক্ষার-জলে আখর তন্বীক্ষামা
দেখ দ্রাক্ষা-সোমে শ্যামে দক্ষোপম
জবলা-ভ্রূণ যমলার্জুন কর্ণসম।
এস শাক্য সাংখ্য কপিল শবর-মিতা
বর্ম তোমায় পিঙ্গলা জ্ঞান পারমিতা
শবরমতীর শর্মিষ্ঠা স্বধর্মিতা
আসুক গোপা খোঁপায় বেঁধে মোহনচূড়া
তোমার কাম-হংস মরুক, সোহং-সুরা
পান-প্রমত্ত চীনের পুতুল চিন্তাতুরা
সূরীয় শ্রীবৎস কেশব, শক-দুহিতা
স্বাতী-সরস্বতী তোমার হোক সহিতা
শঙ্খিনী-পদ্মিনী পুরন্ধ্রী শায়িতা।

যাত্রা করো পৌষে পূষণ অগ্রমেষ
দোলে দুলুক উর্বশী রাস উড়াক কেশ

পুলকেশীর কোলে আসুক শূর গণেশ
দক্ষিণা যম নীল-যমুনার নর্মদাতা
দীপে-দ্বীপে নীল যবনীর জন্মদাতা
অরিত্রিয়ন আরবি-সাগর নর্মদা তা
জানত, শচী নরমদা, নেই স্বর্গধাম
নাম রূপ নেয় কাম রূপ নেয় পরশুরাম
নহুষ-উশন সব ঈশানীর বিষে মেশা
মৎস্য-গঙ্গা শান্তনু সৎব্রতীর নেশা
কৃষ্ণা-দ্বৈপায়নে বরবোহার হ্রেষা
চণ্ডিমা নয়, অর্যমা নয় আর্য মাতা
মার জয়ে দিক্-বিদিক্ জুড়ে মৌয গাথা।
মুগ্ধ যোগ-নন্দে মগধ কমল-কলি
একচ্ছত্র মহাপদ্ম শূদ্র-বলী
রাকায় আঁকা পদ্মমধু নয় শোষিতা ॥
চীনাংশুকের তাণ্ডব তমোময় প্রোষিতা ॥

পূর্বাশা, অগ্রহায়ণ ১৩৫৯

কিরাতার্জ্জুনীয়ম্

তুমি ছিলে না তো স্নাত
তনু-মনে তাই দেখেছি সে কী যে তাতল অতনুজাত
উষসীর মতো নও
তবু যে যোষিতা মরি-মরি উমা পঞ্চমাগ্নি বও!
অমাবস্যার দ্যুতি,
কত না তগর মল্লিকা বেলা সেঁউতি জাতি ও যূথী
ফুটিয়েছ মনোরমা
পুষ্পবৃষ্টি করেছ শিবের শিরে শাশ্বতী-সমা!
কেন আজ অভিমান
তেমনি তো কেউ অজগর-ঢেউ ঘুম জাগানিয়া গান
বুকে নিয়ে সমাগত—
জাগর মরীচি সোনার মারীচ, চিত্রাঙ্গদা-ব্রত
চিরদিন ছিল মনে
তোমার, তাই তো শায়িত হলাম অরণ্যে-উপবনে!
তপোবন তারে ভাবো!

সেখানও আমি নওমালিকার ফুলের গন্ধ পাব।
মলিন মালিনী-নদী,
সমুদ্র-সাধ ঘোচাব তোমার বুকে পাই আজ যদি॥

চতুরঙ্গ, মাঘ ১৩৫৯

স্মরণে

তোমার নাম তো নয় শাড়ির আঁচল
টেনে নিয়ে মোছা যাবে শাওনের জল
অশ্রুর ছবি চোখে ঝলমল ফোঁটা।
ফোটা ফুলও হত যদি ছিঁড়ে নিয়ে বোঁটা
হৃদয়কে দেয়া যেতা সুরভিত শ্বাস।

নাম নয় আকাশের কোনো নামী তারা
তাকিয়ে যে বাকি ক'টা দিনের পাহারা
পার হয়ে পাব এক কবোষ্ণ আবাস
মরণ মেরুর শীতে মেরুন আলোর
অরোরার ভিড়ে।
আর আছে কি সে ভোর?

প্রেম নয় খালি শালীনতা আমাদের
এ কথা বলার আছে। যদি এস ফের
পৃথিবীতে দিতে শীত প্রেত হয়ে আজ
কি অশীল আগুনে যে এ-দেহ নিলাজ
হয় অহরহ নিজে দেখে যাও এসে—
সে কোথায় যারে রেখে গেছ ভালোবেসে॥

কবিতা, আশ্বিন ১৩৬০

উৎক্রান্তি

প্রথম আষাঢ়ে শুরু আশ্বিনেও শেষে
এক বর্শা-ধার
বাঁধানো বর্ষার।

জামির বাতাবি লেবু কমলার ফুল
এ সময়ে গন্ধ নিয়ে বালুর আশ্লেষে
বাবিলোন-লেবাননে জরুসালোমের পাখি হয়
লুপ্ত তবু সব ক্ষতি-ক্ষয়,
শূন্যতা পীবর হতে দেখি :

অলক্তক মুছে মেয়ে পায়ে পরেছে কি
(হয়তো ভাবি-ও মনে-মনে)
খাড়ু? মল? না-কি পাদুকায় মুড়ে অনার্ত ভ্রমণে
পা-দুখানি ঝুমুর মাতাল!
তাহলে তেমনি আছে এখনো তা লাল।

সালোমে, তোমার মন খুঁজি।
যেখানেই থাকো তুমি আমার নিঃশ্বাস যাবে বুঝি
তোমরা নারঙ্গী গন্ধ নিতে।
কোনো এক প্রমত্ত নিশীথে
সদ্য মৃত ঠোঁট পাবে তোমার দংশন,
ভুলে যাবে জীবনের সব অনশন।

চাঁদোয়ার নিচে চাঁদ-তারা
আমিও দেখেছি নিভে যেতে—
দালানের চুনবালি খসে হতে দুরন্ত সাহারা।

বর্ষা চোখে নিয়ে বসে থাকি,
যদি ভীত পাখি
ঘরে আসে বৃষ্টির সঙ্কেতে।

ক্রান্তি, আষাঢ় ১৩৬১

একটি নবোঢ় হাত

একটি নবোঢ় হাত আমার হাতেই তার মন
প্রৌঢ় হতে-হতে আজ লোল
আসছে বসন্ত আর বর্ষার কল্লোল
গাছের পাতায় আর শাখায় তেমনি সব দোল
শুধু হাত থেকে চলে গেছে সমীরণ॥

কবিতা ১৯শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, চৈত্র ১৩৬১

ইন্দ্রজা

যত নদী ছিল যত পাহাড়ের চূড়া থেকে খসা,—
যত না হ্রদের হৃদ্‌পিণ্ড-জোড়া নাড়ী,
স্ফটিক, লোহিত, নীল, দুধ-সাদা তুষারের বশা,
মনে এনে সব-কিছু ডাকলাম কাকে তাড়াতাড়ি,
যেতে হবে বলে—কাকে ডাকি?

যত দিক ছিল চোখে গণিতের মতো,
আকাশের দৃকে নীহারিকা-ইতস্তত,
পাতালের ঝিরঝিরে বালুর সরণি—
চুল-ছোঁয়া পায়ে-দেওয়া বাসর-তরুণী
নামে ওঠে মনে—সব ফাঁকি!

সব ছেড়ে চলে যাওয়া এত চুপচাপ!
গেল তো কতই আরো, নেমে গেল সাপ
গরল-গমনে, স্মৃতি পলকের পরে নেই আর,
তেমন আমার যাত্রা সুপ্তির সমুদ্রে অনিবার,
পাইনে তোমায়, ফিরে আসি।

তুমিও তপস্যা ছেড়ে গেলে যদি তৃষ্ণা রাখি কোথা।
দেবে আর কোন্ বুক আলাপন-স্রোতা
সুপানীয় বারিধারা কণ্ঠে নিতে ফের জন্মান্তরে?
দেবে যদি বলে কেউ, ফিরি তবে ঘরে,
ফিরে তোমাকেই ভালোবাসি॥

কবিতা ১৯ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৬২

সুধন্বা

ভাঙা সিঁড়িতেই, বঁধু, দাঁড়ালেম আমি
আবার হৃদয়ে রেখে হাত।
কী কথা হারিয়ে গেছে জানো অন্তর্যামী
যদি জানো তেমন আঘাত।

তোমার জানাতে যদি ফিরে আমি জানি-
আবার হয় তো করে নেবে রাজরানী!

আবার তোমার রথে সবিতার আলো
ধনু হয়ে আসবে যে হাতে!
আমি তীর খেলা যদি না-ই শিখি ভালো
তুমি তা সরিয়ে নিও জ্যা-তে॥

ময়ূখ ৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা, শারদীয় ১৩৬২

বৌ

কোথাও এমন বিন্দু নেই
যেখানে থেমেছে এসে প্রাণের কলঙ্কী ইতিহাস,
সমুদ্রের গান শোনে সাইক্লোনে ঘাস।
কোথাও পাপের ক্ষয় রাখেনি তেমন কিছু পরিচ্ছন্ন খেই
পাবকের মতো, যার নীল বাহুপাশ
পাব নদ-নদী-হ্রদ-সমুদ্র সিনানে।
তবু অস্নাতক দিনে খুঁজে নিতে হয় যদি না থাকার মানে
তোমাকে দেব না আমি যেতে
কোনো বিবাহিত-রাত্রি-ঝলসানো আগুনের ক্ষেতে
পাছে আলোকিত ক্ষণে ক্ষত মুখ পাও
যা তুমি, অথবা হতে পারে মায়া-সবুজ কন্যাও
যা তুমি অনেক জন্মে ছিলে,
আমি উনপঞ্চাশের ফলতরু পঞ্চডাল নীলে!

ঃ কবিতা ২০ বর্ষ ১ম সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৬২

জার্নাল, আষাঢ়

একটি সন্ধ্যার মুখে ভিজে মুখ রজনীগন্ধার।
আমি হতে থাকি অন্ধকার
তোমাকে রাখব বলে ধরে।
বিষণ্ণতা সুরভিত হয় চরাচরে।

সংলাপ, শারদীয় ১৩৬৪

জার্নাল

ভুলে যাই যখন তোমাকে
শুধু ব্যর্থ ব্যাকুলতা থাকে
রক্তের ভেতর।
কোনো জলে মেটে না পিপাসা—
তুচ্ছ ভালোবাসা—
সময়ে কলঙ্ক করে ভর।
আশা নেই, তবু স্মৃতি থাক—
বসন্ত যে ছিল মনে রাখুক বৈশাখ॥

অগ্রণী, শারদীয় ১৩৬৪

জার্নাল

১

আমার ঘুমের অন্ধকারে
সে শুধু আলোয় জেগে রয়,
আমি এলে আলোর সংসারে
শায়িত সে ঘোর সুপ্তিময়।
তবু যেন তাকে পেতে হবে
কখনো হঠাৎ পথে থেমে—
দাঁড়াবে সে গা ঘেঁষে নীরবে
জানাতে, ছিলাম তারি প্রেমে॥

২

পাঁচ-হাজার বছর জোনাকি
আমার রক্তের অন্ধকারে।
মমতায় দেহের অঙ্গারে
নক্ষত্রের রাত্রিগুলি রাখি।
ক্লান্তি-সমুজ্জ্বল হোক মন,—
মহা-ইতিহাসে ধ্রুবতারা—
যদি সব রণ-রণাঙ্গন
জোনাকির আলোয় ইশারা॥

উত্তরা, আশ্বিন ১৩৬৪

তোমার ছায়া

তোমার শরীরে ছিল যে ছায়া সে এখনো আমাকে
পথে-পার্কে-ট্রামস্টপে ডাকে—
আমি হাঁটি, হঠাৎ দাঁড়াই,
হয়তো তোমার হাত খুঁজে আমি হাতও বাড়াই
সন্ধ্যা হয়ে এলে।
তোমার মৃত্যুর চেয়ে সত্য এক ছায়ার বিকেলে
তুমি যেন পথ-হাঁটা মেয়ে
তার গায়ে তোমার সে-ছায়া মিশে থাকে—
রাত্রি কাটে যে ছায়াকে পেয়ে॥

গণবার্তা শারদীয় ১৩৬৪

বরণীয়

যে দিন এসেছে ঘরে সব তারা নিবিয়ে আকাশে
কী অক্ষত অন্ধকার ছিল চারপাশে
তুমি যার বিষণ্ণ বাতাস!

বাতি জ্বেলে শ্বাস ফেলে উজ্জ্বলতায় করিনি যে নাশ
মৃত মুহূর্তের মৌন— তাই ভালোবাসা :

শরীরের পরিসরে নিরবধি সেই উপস্থিতি শুধু ধরে নিয়ে আসা
হয়নি যে নদী— তীব্র শর—
বাতাস বিদীর্ণ করে ভেঙে দিতে মাটির বাসর॥

আনন্দবাজার পত্রিকা, বার্ষিক সংখ্যা ১৩৬৪

গৌড়ীয়

যখন আগুন নিয়ে সংবর্ত ঘনায়,
ফুৎকারে নিবিয়ে দিতে তাকে
এখানেই ছিল শেষ নাগ তার পৃথুল ফণায়।

শিবাকুল ফিরে যেতে থাকে
রত্নখণ্ডে সন্দেহে তাকায়—
যে নয় ব্যাকুল তবু যেন লীলাচ্ছলে
ময়ূর সে, মেঘোদয়ে ভুলে শুধু বর্ণালি মাথায়
দেহে, শেষে নত যেন ধরা-সন্ধি ভেঙে গেছে বলে।

কবিপত্র, বৈশাখ ১৩৬৫

'সবিতা'-উত্তর

কে নেবে এ কুম্ভ—যে নিত সে নেই আর আজ
একটি ফুলের হাসি নিয়ে,
তার কালো-চুলে আর নেই কারুকাজ
চূড়া-বাঁধা, সে নিয়ম মনেই বিনিয়ে
কাঁদনের মতো আমি বেণী বাঁধি বসে থাকি ভূমিতে লুটিয়ে।
ফুরোয়নি কথা তাই মনের দুটি এ
শুকসারী হয়তো কখনো
ঘটের মাটির লেপে হালকা হয় যেন কুম্ভ ঘন।
তার নমুনায় কত নক্‌সা আঁকা যায়
জল-রাখি পাত্র ভরে ভরা-মন কেবল যাচায়।
তখন হঠাৎ জল-খেলা রেখে মনে পড়ে গোপীযন্ত্র আমি
কোথায় পাব সে ভার গিঁটে বাঁশ—কামনায় কামী
হলেই কি আর ফিরে আসবে সে কোনো এক বেশে
ঘাস-বাঁশ-অলাবুর দেশে?

কবিতা-মেলা স্মারক পত্রিকা, আষাঢ় ১৩৬৫

কচের উক্তি

দেবযানী মেয়ে,
তোমাকে এসেছি ফেলে আজ ফিরে চেয়ে
পাব না তো আর।
কোন্ যযাতির পুণ্য দ্বার
আলোকিত করে তুমি চেয়ে থাকো পন্থ পানে আজ—

তোমাকে উজ্জ্বল করে কোন্ মহারাজ
তাকে ঈর্ষা করিনে তো আমি—
শুধু মনে হয় ফিরে আবার পাতালে যেন নামি
তোমার নামের মধু পায় যবে মন।
তোমরা সংসার-ভরা পূর্ণ আয়োজন—
অবসরে তার
আমার নামের কোনো লেশ
খানিক আবেশ
লেগে থাকে মনে কি তোমার?

অগ্রণী, শারদীয় ১৩৬৫

শ্রাবণের সিক্তদিন

শ্রাবণের সিক্তদিন ব্যেপে
ওঠে কেঁপে-কেঁপে
হৃদয় আমার।
প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকার
দেখি যেন নীলিম আকাশে।
অশ্রুবিন্দু জমে ঘাসে-ঘাসে
যেন এল মরণের পালা।
পৃথিবীর রম্য চিত্রশালা
মুছে গেল চোখ হতে বুঝি।
মনে-মনে খুঁজি
আলো-দীপ্ত দিন।
শ্রাবণের অন্ধকারে সব আশা হতেছে বিলীন॥

উচ্চারণ, ৩য় সঙ্কলন ১৩৬৮

স্মরণে

একটি ফুলের মতো সুরভিত তোমার স্মরণ!
তুমি ছিলে ফাল্গুনের মন
খুশি দিয়ে ভরা।

আমি তার স্মৃতির পসরা
বহুদূর বয়ে আজ ভাবি,
দিয়েছিলে কবে যেন হৃদয়ের চাবি,
সে হৃদয় লুটেছি দু-হাতে।
আজো ঘুম ভেঙে গেলে কোনো মধ্যরাতে
নিশ্বাসে তোমার গন্ধ পাই।
সব ব্যর্থতাই
ভরে যায় পূর্ণতার স্বাদে।
তোমাকে হারিয়ে তবে মন কেন কাঁদে,
কেন তবে এত কথা বোনা?
তুমি তো হৃদয় ভরে আকাশ—আকাশময় সোনা॥

জয়শ্রী, বৈশাখ ১৩৬৯

রূপকথা

দুপুর রুপোলি নদী, তার জলে রূপকথা বোনা
বসে-বসে তাই শুধু শোনা
রক্তের আলস্য নিয়ে যেন অবিরাম।
কে সে রাজকন্যা, কী যে নাম
কোথায় যে ঘর তার জানিনে কিছুই।
তবু হাতে হাত যেন ছুঁই
তবু যেন পাই তাকে বুকে।
সেও কী উৎসুকে
আমাকে জানায় তার অল্প ইতিহাস—
আমি তার পাই মৃদু শ্বাস
সুখী আমি এ অল্প পাওয়ায়।
তারপর সব ছবি মুছে যায় বিকেলের দুরন্ত হাওয়ায়॥

উত্তরসূরি, আষাঢ় ১৩৬৯

মৃত্যুরাগ

জীবনের অনুজ্জ্বল বিকেল এখন
সন্ধ্যায় শরীর প্রসারিত।
সংসার-বিরাগ রক্তে যে প্রেম, বঞ্চনা, ঘৃণা দিত
তারা আজ ফুটিয়েছে প্রশান্ত গোলাপ।
হৃদয়ের গাঢ় পাপতাপ
নিশ্চিহ্ন, সেখানে আজ সোনার লেখন
আকাশেরি মতো।
কী দরিদ্র ছিলাম অতীতে!
পাবার বাসনা যেন রক্তমুখ ক্ষত
নিরন্তর ব্যথাই ঝরাতো।
আজ দেখি না তো
ব্যবধান আছে কিছু লাভ ও ক্ষতিতে,
না পেয়েও মনে হয় সব পাওয়া গেছে।
মৃত্যু ওঠে বেঁচে,
ঘোচায় হয়তো সব দায়,
বলে : আমিই তো আছি গোলাপি সন্ধ্যায়॥

চতুরঙ্গ, চৈত্র ১৩৬৯

দুপুর

গাছে-গাছে প্রফুল্ল বাতাস।
দুপুর। এ ঘরে পড়ে তার তপ্তশ্বাস
ঘনিষ্ঠ দেয়ালে আর সাদা বিছানায়।

কী ভূমিকা আমাকে মানায়?
হৃষ্ট, অনুতপ্ত, রোগী— নির্জনতা নিয়ে?
যা হই, আমাকে আমি নিয়েছি বানিয়ে
তা নিয়ে এ ঘরে বারো মাস।
দুপুর ফেলুক ঘরে তপ্ত দীর্ঘশ্বাস
তবু আছে গাছে-গাছে প্রফুল্ল বাতাস॥

অরণি, শারদীয় ১৩৭০

সত্তার দাবি

বহুদিন কেটে গেছে উগ্র জাগরণে :
ভিড়-কোলাহল-মত্ততায়।
গড়তে পারিনি মন মনের ধরনে,
গানের তড়িৎ-স্পর্শ আসেনি কথায়।

আকাশ মন্ত্রের মতো, বৃক্ষ যেন একক প্রার্থনা,
আমি আকাশের নিচে ব্যর্থ, ভিন্নমনা
নিজেকে করেছি ক্ষয় তুচ্ছ অনুরাগে।
সত্তার প্রগাঢ় দাবি তাই শেষে জাগে :
আমাতেই আমি যেন হই সমর্পিত।

তা-ই প্রার্থনার মন্ত্র ঋত ও নিভৃত॥

জয়শ্রী, শারদীয় ১৩৭০

অবিনয়

প্রার্থনার মন্দির আকাশ।
তরুলতা, ঘাস
স্তম্ভিত স্তম্ভের মতো আত্মনিবেদনে।
আমি শুধু কোলাহল হৃদয়ে ও মনে :

নীরবে ফোটে না ফুল আকাশের দিকে
ধরে না নীরব ফলভার।
আমার উদ্যত অহংকার
আকাশ বিদীর্ণ করে, সে নীল স্ফটিকে
তবু আলো, তবু হাওয়া আমাকে জানায় সম্ভাষণ।

বিনয় সর্বত্র। শুধু আমার আসন
ঈশ্বরের স্থানে!
এ মাটিতে, এই ঘাসে হারিয়েছি জীবনের মানে॥

দেশ, শারদীয় ১৩৭০

যাত্রাশেষ

আরো কিছু দূর যেতে হবে।
সে কি জীবনের, না কি মৃত্যুর সৌরভে,
মৌমাছির মতো, জানা নেই।
জেনে যেতে হবে যেন ফের জানাকেই
আকাশের মতো এক প্রশান্ত আলোতে।
কতদিন হতে
সে-মন চেয়েছি আমি যে-মনে প্রেমেব চেয়ে গাঢ়
আছে কিছু : প্রমা। আর পেয়েও যে আরো
পাবার প্রত্যাশী নয় : কামিনী-কাঞ্চন।

যতটুকু যেতে হবে সঙ্গে যদি থাকে সেই মন
মনে হবে জীবনের পূর্ণ ঘটখানি
মৃত্যুর দুয়ারে রেখে মঙ্গলে মুছেছি তার গ্লানি।

গণবার্তা, শারদীয় ১৩৭০

কথার ভেতর কথা

একটি গভীর নাম দাও আকাশের,
ঈশ্বরের মতন্ গভীর।
হোক তবু উচ্চারিত থরথর হৃদয় কবির
মন্ত্রে, কথা বলেছ তো ঢের,
কথার ভেতর কথা শোনাও এবার।
তুচ্ছ অনুরাগ অনুভব যত দেবার-নেবার
শেষ যদি হল, কর সুবিশাল স্থান
তোমার অমেয় মন, আকাশ-সমান॥

উত্তরসূরি ১১ বর্ষ ১ম সংখ্যা, পৌষ ১৩৭০

আলোর স্বভাব

আলোরি ক্ষমতা থাকে, অন্ধকারে প্রবেশ করার
এবং সৌজন্য সহিষ্ণুতা।
তবেই সন্ধ্যার থেকে নক্ষত্রের স্থির চোখ, স্থিরতর কথা
হৃদয়ে রাখতে পারো, তবেই ডাকতে পারো ভোর
যে ভোর আলোর দেবালয়।
এখনো সে-দেবালয়ে উষা-অপ্সরার
রঞ্জনে আকাশ মোছে চোখে ঘুম-ঘোর
দেখতে তোমাকে চোখে-চোখে যদি থাকে কোনো পূর্বপরিচয়।

বস্তুত, চোখই সেই আলোর দেবতা।
অন্ধকার হতে গাঢ় অন্ধকারে যে আলোর লতা
বিশ্ব-বিসর্পিণী, হায়! দৃষ্টিহীন, পাও না তাকেও!
তোমার অসূর্য স্থান, কাল, তুমি নিষ্ফল চীৎকার
তোমাতেই লীন ; আর সৌরলোকে হৃদয়বিস্তার
যে বৃক্ষ অজস্র চোখে, ঢেউ দেয় তাকে, নীল, স্মৃতি, নীল ঢেউ।

পূর্বাশা, শ্রাবণ ১৩৭১

ফুল-বিষয়ক

সূর্যেরও মৃত্তিকা আছে স্থিরতর আরেক আকাশে
যার সে-ই বৈশাখের ফুল।
যেমন এ কৃষ্ণচূড়া সহজ, নির্ভুল
বৈশাখেই আসে।

সূর্য, কোন্ বৃক্ষে তুমি ফুল?
কোন্ মাটি সে বৃক্ষে ব্যাকুল?
কোন্ ব্যাকুলতা নিয়ে মাটি ফুল হয়?

সেই ব্যাকুলতা হও, হে হৃত হৃদয়,
একবার গেয়ে ওঠ পাখির মতন!
শরীরের ক্লান্ত আয়তন
হোক না বারেক কৃষ্ণচূড়া—
জানে না যে কোন্ কাল-বিন্দু তার রক্তে কামাতুরা!

অলিন্দ ১ম বর্ষ ২য় সঙ্কলন ১৩৭১

মর্মর ধ্বনি কোনো

দক্ষিণের ট্রেনে সিটি।   ভোর-রাত্রি, তোমাকে জাগায়।
চারটার ঘন্টা পড়ে। প্রহরী-বাড়িও কাছে-পিঠে রাত জাগে।
মর্মর ধ্বনি তো নয়।   ভূকম্প লাগায়
থরথর অখ্যাত স্টেশনে।

তবু কি জাগে না কোনো স্পন্দবোধ ঘুমন্ত এ অন্ধকার মনে
স্মরণ : এ দক্ষিণেরই পূর্ব-অনুরাগে
ছিল যে অঙ্গন-দ্বারে পল্লবিত একটি বাগান?

স্বপ্ন ভাঙে কিন্তু জেগে উঠি রূপনারায়ণের কূলে।
এখনো আকাশ দেখি। শুকতারা সুন্দরী তেমনি
দীপাবলী জ্বালি তাই। পাতালের খনি
নিকষে সুবর্ণরেখা আঁকে!
কী সুরম্য গলি-পথ! দূর-ও নিকট নেই আর।

বারান্দার থেকে ঘরে এসে আজ দেখেছি তোমাকে—
তুমি, ফের সঞ্চারিণী গান—
লতায়, পাতায়, ফুলে-ফুলে।
মাটির মেঝেতে এক ভিখারির সাজ, অলংকার॥

এক্ষণ, আশ্বিন ১৩৭১

বাগানে ফেরার দিন

মেঘলা আকাশে ভোর। ঝোড়ো কাক ডাকে।
রাত্রির আঁধার-ঝড়ে কত দূরে ফেলে আমি এসেছি তোমাকে
কত দূরে, ঘরে, বিছানায়!
বারান্দায় এসে আর শুনিনে নিশ্বাস!
তোমার সাজানো ঘরে তোমাকে মানায়,
সুন্দর অনেক দিন, অনেক বছর করে বাস,
আমি বারান্দায় এসে সিঁড়ি দিয়ে পথে নেমে যাই।
সরু গলি, জল-ঝড়ে হাড়-জমা। তাই
কাঁকরে পা পড়ে, ওড়ে মাথার উপর ঝোড়ো কাক।

তুমি কি ডেকেছ সত্যি ঘুমের নিশ্বাসে?
গলির কুণ্ঠিত হাওয়া কুড়িয়ে হঠাৎ মনে আসে,
মনে আসে ছেঁড়া-ছেঁড়া কথা :
'এসো'—কোনোদিন যেন মোড়ে কিম্বা জানালার থেকে
বলেছিলে। বলেছিলে, 'আসবে?' বোশেখে
এমনি ছিল কি সন্ধ্যা, সন্ধ্যায় অপর সন্ধ্যা মেঘ
এবং তৃতীয় সন্ধ্যা—অন্ধকার তুমি?
মেঘ যেন মেঘ নয়, জলভরা স্তব্ধ আকুলতা!
তুমি যেন তুমি নও মৌসুমি-আবেগ—
আমন্ত্রণ কার—কোন্ সিঞ্চিতা রাত্রির?
ঘুমের নিশ্বাস ফেলে বিদায়ের বন্ধ্যা বালুতীর।
সরু কাঁকরের পথ কোথা গিয়ে শেষ, শেষে কোন্ মরুভূমি?

ভোর হল মেঘলা আকাশে।
এ ভোরে কি মনে আসে ছিল কবে আমার বাগান?
বাগান! বাগান! পাখি-ডাকা গান হয়ে মনে আসে।
কোনো সুখী পাখি করে ঘাসের বৃষ্টিতে নেমে স্নান।
কোনো শিশু পাতার আড়ালে
হেসে ওঠে আলো হয়ে আবার চিকন ডালে-ডালে—
পলাতক কোনো শিশু, যে এখন হাঁটে পাশে-পাশে॥

আনন্দবাজার পত্রিকা, শারদীয়া ১৩৭১

ঘরে ফেরার দিন

পশ্চিমের জানলায় রোদ বলে : 'এস এ বিকেলে—
কথা বলি যতক্ষণ মুখোমুখি আছি,
ফুলের বাগান থেকে চাকে ফিরে যাবেই মৌমাছি,
এ-ঘর সে-ঘর, সন্ধ্যা হলে, এক সবি।'
তুমি দুপুরের আঁচে নুন-জল ছবি,
পথের সমস্ত ধুলো ঘরে নিয়ে এলে!
কাহিনী শোনালে : সব নদীজল বাষ্প হয়ে গেছে,
যত বৃষ্টি হয়েছিল তা নাকি সেকালে
মাটি ধুয়ে কা রেখেছে কাঁকর-খোয়াই ;
এক মুঠো ঘাস নাকি পাব না, সবুজ কথা, কী হবে, দেখালে

সব পথ ধুলো, ছাই সব ঘর সেখানেই যাই!
তা-ই যদি কী ভাবে যে তুমি এলে বেঁচে!
তুমিও তো ছিলে তবু, চিকনো পাতার ছিল হাসি
ফুল ফুটবার আগে, ছিল এক ফুলের বাগান।
বলেছি তোমাকে ছুঁয়ে শিহরিত কথা : ভালোবাসি—
গানের যা গান!
যে গান গাইবে বলে নীড়ে ফেরে পাখি,
সে কথা শোনাব বলে এখনো জানালা খুলে রাখি।
ফুলের বাগানে কারা খুঁড়ছে কবর
সে কথা জানাবে বলে জানালায় রোদ, ঘরে তুমি?
কোন্ শীতে রোদ চেয়ে পেয়েছিলে জ্বর,
অপর্ণা, হবে না তাই আর ফাল্গুনের ফুল-ভূমি।
ঘর! তবু ঘরে ফিরে এলে!
সন্ধ্যা হবে— রক্তফুল, তারি কান্না রোদের বিকেলে॥

অমৃত, শারদীয়া ১৩৭১

দেবযানী-কাহিনী

সেই সব ভোর মনে পড়ে।
পোয়াতী তারার ভোর, তা-ই নাম ছিল সে তারার,
আজ তার নাম জানি, মানে জানি সব ইশারার
জানি সে কখন মন ভাঙে, মন গড়ে।
সেই সব ভোরে কোনো মানেই ছিল না।
জানতাম, মেটে ঘরে ভোর আসবেই
বেড়ার বাসক-গন্ধ হাওয়ার শাড়িতে তার বোনা
নীলচে হাওয়ার গন্ধে নীলচে তারার চোখে ভোর
আভা আসবেই ঘরে যদিও তা উজ্জ্বল আলোর
এমনি আশ্বিন-মাস, যে আশ্বিন নেই।
'আসিনি তো', বলবে সে-রূপসী এখন :
'কোনোদিন এর আগে আসিনি তো এই ঘরে আর!'
বলবে সে দেবযানী-তারা।
শুনছে এখন তার নাম-জানা ভাঙা-ভাঙা মন,
বলছে এখন মনে, পুরাতন ভরা মনে পাবে বলে সাড়া-
নীলচে দেয়ালে নাকি, ভোর নয়, ছিল অন্ধকার।

হয়তো বা তা-ই। এই ঘরই তোমার সেই কূপ,
তোমারি কান্নার রঙে অন্ধকার ইঁটের দেয়াল
আলোতে উজ্জ্বল তুমি পাতাল-উত্থিতা অপরূপ—
পাতালে যে বাড়িয়েছি হাত তা-ও হল কত কাল।

জয়শ্রী, আশ্বিন ১৩৭১

মাতা সাক্ষাৎক্ষিতেস্তনুঃ

একটু মাটির গন্ধ দাও এ হৃদয়ে,
কত আর আকাশে তাকাব?
নীলাম্বরী, ঢেকে আছো কোন্ ঊর্ণনাভ
ঊর্ণাজালে, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ে
নেই যার আনন্দ-বেদনা!
আমার মায়ের লাল চেলির সুগন্ধ রক্তে দাও,
চোখে আঁধারের আরাধনা,
যে আঁধার হতে আসে বসন্তের ফুল,
যে রুদ্র আঁধারে কোটি নক্ষত্র উধাও।
সহৃদয় রজোতমো শরীরে ব্যাকুল।
একটু রক্তিম গন্ধ দিয়ে যাব মিশিয়ে হাওয়ায়
ঘুমের কাজল যদি পরে থাকি মাতা-মর্ত্য-মৃত্যুর চাওয়ায়॥

শারদীয়া দেশ পত্রিকা, ১৩৭১

জন্মদিন স্মরণে

কুসুম-আয়ুধ, তুমি জন্ম দিলে এই প্রাণকণা
চূতমঞ্জরীর দিনে। বসন্তবাহার
কোন্ রুদ্রবীণাতারে তখন স্বাহাব
সাধে মন স্বাদুনীরনিমগ্ন পুলিনে?
সে ঐন্দ্রজালিক রক্ত বৈশ্বানরময়ীকে যদি বা
ভারতী করেছে মহাবেদনার ঋণে,
যদি লুপ্ত-সরস্বতী হয়ে থাকে মেঘ্না নদী বা
সে কি শুধু প্রেম-প্রতারণা?

মনে পড়ে, আম্রকুঞ্জে সে আমার চেরীফুলোৎসব!
তুমি তো দাওনি হাতে রক্তরাঙা কিংশুক-অশোক
দিয়েছিলে মাধ্বী চূতমঞ্জরীর ভ্রতম শর
আলগ্ন তখনো যাতে ভ্রমরগুঞ্জন,
মন যদি তা-ই নিয়ে করে স্বরসপ্তকের দীপ্ত আয়োজন,
আগুন জ্বেলেছে সুর, জ্বালেনি তো চোখ—
তাতে তো বিদগ্ধ তুমি, দগ্ধ নও, হে অবিনশ্বর,
হয়তো আমার রক্তে করেছ নিজেকে পরাভব।

তথাপি দিশারি তুমি। কৃষ্ণা শিখা লোহিতাভা হয়,
ক্রমশ দহনে তীব্র শুক্লা সরস্বতী।
কলহংসধ্বনি শুনি অতীতের থেকে ভবিষ্যতে—
সমস্ত হৃদয় তুমি করে দিলে আমার ফাল্গুন!
শতদল ফোটাল যে কী সমুদ্র-নুন—
জন্মের বেদনা বেদগান!
প্রাগুষায় শুরু, ঝরে সারা দিনমান,
ঝরে রজনীর ধ্বনিময় ছায়াপথে :
সে যেন আমার স্পর্ধা, আমার প্রণতি।

সফল হে পুষ্পধনু, তোমার বিনয়॥

উত্তরসূরি, কার্তিক-পৌষ, ১৩৭১

পান্থনিবাসের কবিতা

পান্থনিবাস, আর কেন বা দেয়াল?
অনল-অনিলে যাক বাইরের বেড়া বা দেউল।
দ্বার থাক খোলা, পথযাত্রী যদি আসে, যদি হয়ই খেয়াল,
বাগান রইল চারপাশে তুলে নিক ফল-ফুল
ঋতুতে-ঋতুতে রংবেরং।
নিবাস হোক না খালি যখন দেউলে ঘণ্টা বাজে ঢং-ঢং
ধাতুপাত্রে. ধূপধুনো, দেয়াসিনী চায় দেহভঙ্গিমায় দয়া।
তুমি তো প্রয়াগ নও, তীর্থ নও, প্রবর্তন করনি তো কোনো প্রথা
পুরোনো বা নয়া।

পান্থনিবাস, তুমি চেয়ো না চেয়ো না দেয়া-নেয়ার হিসেব।
যারা পুজো পায় তারা অদেব কি দেব
কী কাজ তা দিয়ে, তুমি ভ্রমরগুঞ্জন
পুঞ্জ-পুঞ্জ বিকীরিত শুনছ তো, কীর্তিমান নও তো শাশ্বত।
দু-দিনের দেখাশোনা, যাত্রী যারা, তাদেরই তো পথ :
নদী ও সমুদ্র, সেতু-গিরিদরী, মরু ও মরুৎ।
তোমার দেয়ালে শুধু সাদা ধুধু-পটে কিছু লালকালো অক্ষরের খুঁত
কিছু নাম থাকে, তা-ই পরম তোমার মরদেহের ভূঞ্জন।

চারপাশে গড়খাই গড়লেই জল হবে ঘোলা।
কাকে দেবে বাধা, বলো বৃদ্ধ অবশাঙ্গে
সাধারণ সত্য : রণে, ঝড়ে দ্বার ভাঙে।
প্রাচীন, প্রাচীর ভাঙো নিজ হাতে, দ্বার রাখো খোলা।

পূর্বাশা, ফাল্গুন ১৩৭১

স্মরণে

বিকেলের শেষ ডাকা। পাখির না। সোনালি মেঘের
মধ্যশরতের? তা-ও নয়।
তবু কোনো শব্দ যেন চূর্ণ হয়ে থরথর করছে ইথর।
কতদিন হয়ে গেল! তবু সে তো আমার ভিতর,
সেই ডাক. তরঙ্গিত! মৃত আবেগের
দিনেও হঠাৎ কেন ঢেউ—ঢেউ আমার শরীর?
বিকেলের শেষ ডাক আসে আজ : এরোগ্রাম, খাম,
মেয়েলি অক্ষর লেখা (উচ্চারিত নানা স্থানে সেই ডাক) আমারি তো নাম।
তাদের জানিনে কোনো ভিন্ন পরিচয় :
মনে আসে এই নাম ডাকা শেষ হয়েছিল যেই খেয়াঘাটে—
শেষ তা হবার নয়, তাই যে তরীর
ফিরে আসা, কী আশ্বাসে, শূন্য রাজপাটে!

পূর্বাশা, আশ্বিন ১৩৭২

শূন্য মন্দিরে

রোজ আমি ডুবে যাই রাত্রিতে, রাত্রির অন্ধকারে।
রোজ আমি ভেসে উঠি রাত্রিতে, রাত্রির অন্ধকারে।
তারপর পারে, কেউ পারে?
কে পারে দিনকে আর ভালোবাসা দিতে?
উপরে যে ভেসে উঠলাম, তাই—শুধু তা-ই মনে পড়ে। শীতে
কখন যে ডুবে গিয়েছিলাম অতলে—
সেখানেও আলো ছিল কি না তারামাছে
মনে করতে গিয়ে বারে-বারে
উপরের তারাই তো ধু-ধু মনে পড়ে! মনে আছে
শুধু নীল ঢেউ, তা-ও আকাশেরি জলে
কৃষ্ণা—মিশে যায় উষা-অরুণার হাতে, তার নিকানোর কাজে—
প্রেমে, দেখি তকতকে মেঝের রক্তিমা, খালি ঘর।

তবু বিছানার ভাঁজে-ভাঁজে
আছে, ভাবি, সহজ, সুন্দর
তোমার চুলের ঢেউ। তুমিও চুলের রাত্রি ছিলে মনে পড়ে
নীল ঢেউয়ে, প্রেমে, জলপ্রভায় প্রভাত-তক না-হারানো নদীর কাঁকরে ॥

পূর্বাশা, আশ্বিন ১৩৭৫

কোনো নিঃসঙ্গকে

তোমার প্রশান্তি কী যে অহংকার নিজে তা জানো না
যখন জনতা ভিত কাঁপায় চিৎকারে!
নোনা-ধরা এ মাটিতে কী ফসল বোনা
হবে আর? অন্ধ ভবিষ্যতে শুধু সুখী মৌনী আছ বন্ধ দ্বারে!
শব্দের আঘাত নেই? আঘাত আনে না তাপ, আলো ও বিদ্যুৎ?
শান্তির সন্তাপ শবশীত যায় ভবিষ্যতে, দশচক্রে ভূত!

—আধুনিক কবিতা ১৬ সংকলন, শারদীয় ১৯৭২

উৎসে অবতরণ

আরো অন্ধকার দাও, আরো, আরো, আরো।
যত পারো শর্বরী আমার।
দাও দাও অতলে নামার
অপূর্ব সুযোগ ; কর আলো অবসান
সামান্য আশারও।
তোমার ক্ষমতা নিয়ে গড়বো শ্মশান :
একটি প্রতিভা— মূর্তি—অগ্নিশিখা, আবৃত যা, শোষিত যা, অমূর্ত তোমাতে।
দেবে তো? দেবে না অধিকার, কুহকিনী, সেই নাবাল-নিলয়ে
আগুনের রং মেখে নিতে দুই হাতে?
ছিঁড়ে চন্দ্রসূর্যের প্রসূন
আলোর বিলয়ে
আমি কি পাব না প্রাণপ্রবাহের উৎস— মৃত্যুহ্রদ—
তোমার অতনু অন্ধকারে?
বন্ধ দ্বারে নাও, নেত্রী, আরো কত অভিনয় হবে খোলা দ্বারে!

অমৃত, শারদীয় ১৩৭২

পদাবলী-প্রবহমান

তপস্যার শেষে

যদি কিছু বল, তাই তাকিয়ে রয়েছি কতদিন,
কত রাত্রি মাস-বর্ষ, চোখ নয় নিদ্রায় মলিন,
তাকিয়ে রয়েছি তীক্ষ্ণ, তীব্র, অপলক।
নিয়তি খেলছে পাশা, চোখে শুধু আসে তার ছক,
কে হারে, কে জেতে তা-ই দেখি।
ঘুঁটির গণনা সেই জানে, আমি সে-সংখ্যা-বিষয়ে
জানিনে কিছুই, তুমি জানো? যদি ভাবি আমি, নিয়তির হয়ে
তুমিই খেলছ পাশা, দন্তরুচি দেখব আশায়
যদি বলি কিছু বল এ সর্বনাশায়
অসঙ্কোচে হেসে, পাব সে হাসিতে মেকি
তোমার যা কিছু সব— পরিষ্কার তপস্যার চোখে—
কালো দুই তারা যার জাগরণে ভরে গেছে তৃতীয় আলোকে।

উত্তরসূরি ১৩ বর্ষ ১ম সংখ্যা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৭২

সদসৎ

মনে হল : জ্যোৎস্নারই তো সিঁড়ি।
আসলে সিঁড়ির ধাপে জ্যোৎস্না পড়েছিল।
মনে হল : উঠে গেলে পাওয়া যাবে বুঝি আগুনের পীঠ, পিঁড়ি—
রঙদার কল্‌কা লাল-নীলও।

আসলে তোমারি এটা কলকাতার ঘর।
আলো? নেই। তারা থাকলেও জলে-গলে-নিভে সব অন্ধকার।
নক্, নক্। সাড়া নেই। নক্তের চেয়েও অন্ধকার কোথা পাবে কণ্ঠস্বর?
অতএব ফিরিয়েই দিলে, বল, দয়া করে দ্বার
খোলা রেখে, ঘর অন্ধকার করে, ফিরিয়েই দিলে!
অথচ আমার আনাগোনা কিন্তু ছিল মনে-মনে
　　আগাগোড়া আগুনের লালে আর নীলে!
যবনিকা তুলে তুমি হাত বাড়ালে না!

আসলে নেবার নেই, তাই বুঝি কারো নেই দেনা॥

কবি ও কবিতা ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, শ্রীপঞ্চমী ১৩৭২

একটি রজনীগন্ধা

আকাশে তামাব চাঁদ, হেমন্ত সন্ধ্যায়!
আকাশে তামার চাঁদ গাছের দ্বিতীয় গাঢ়তর এক সন্ধ্যার আড়ালে।
পথেও কি অন্ধকার সন্ধ্যা হয়ে তুমি পা বাড়ালে?
লাইটপোস্টগুলো কেন ধোঁয়াটে তন্দ্রায়
দ্বিতীয় সন্ধ্যায় সব অনুজ্জ্বল তারা?
কার অভিসন্ধি? সে কি তৃতীয় সন্ধ্যার?
তোমার সঙ্গে যে দেখা হল আজ পথে!
তেমনি তন্দ্রালু চোখ, জেগে থেকে যেন কোনোমতে
বললে ছায়ার স্বরে : 'কেমন আছেন?'

আমি কি শুনেছি গান, যে গান শোনে না কেউ রজনীগন্ধার?
আমার তামার চাঁদ চুকোলো কি সব লেনদেন
অন্ধকার ছুড়ে-ছুড়ে সন্ধ্যা গড়ে-গড়ে?

একটি রজনীগন্ধা, কালো মেয়ে, রেখে গেলে পথের উপরে॥

আধুনিক কবিতা ১ সঙ্কলন, চৈত্র ১৩৭২

উষ্ণতা

সব শিশু হেসে ওঠে আগুনকুণ্ডের চারপাশে
পৃথিবীর শীতে।
পৃথিবীতে শীত আর রক্তে আগুনের হাহাকার।
হাহাকার হাসি হয়ে আসে।

কান্নার সংগীতে
পাতা ঝরে যায় বার-বার।
বার-বার আগুনকুণ্ডের চারপাশে
শিশুর উষ্ণতা হেসে ওঠে, আসে, হাসে॥

পূর্বাশা, আশ্বিন ১৩৭৩

দুপুর

সমস্ত দুপুর আমি আকাশের নীল শব্দ শুনি,
যে শব্দ নদীর, নদী, শৈশবের জল।
সে জলে অনেক রৌদ্র স্নান করে হয়েছে শীতল
তারা যেন অনেক তরুণী
গাছে-গাছে সবুজ হাওয়ায়
সকালের কথা দিয়ে যায়।
কথা দেয় নদী তাই কথা দেয় আকাশ এখন
কথা দেয় সব কথা ভুলে গেলে মন।

পূর্বাশা, অগ্রহায়ণ ১৩৭৩

সরীসৃপ

সরীসৃপ! নীল অন্ধকারে দ্রুত পাপ,
সমস্ত সন্ধ্যার অভিশাপ
শরীরী বিবরে!
থাকা যায় সুসজ্জিত ঘরে
স্থবির সজ্জন!
তথাপি যে-কোনো অন্ধকারে নগ্ন ভূতপূর্ব মন।

অলিন্দ, বৈশাখ ১৩৭৪

দুর্বোধ্য খাঁচায়

দুটি অন্ধকারের দেয়াল
সামনে পেছনে।
তবু মনে হয় খুব খোলামেলা, আলো
চারপাশে, মাথার উপর।
পাখিরা আবহমানকাল ওড়াওড়ি করে যায়
দুর্বোধ্য খাঁচায়!

অলিন্দ ৫ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৭৪

জন্ম

শ্মশানের মতো রাত্রি পোড়ে চৌরঙ্গিতে।
শরীরের অনিবার্য শীতে
তোমরা সেখানে যাও, আমি এইখানে
একটি শিশুর উষ্ণ জন্ম দেখি ফুলের বাগানে॥

অলিন্দ ৫ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৭৪

না

গাছে ফুল ছিল,
এবং আকাশে রোদ, উড্ডীন কপোত।
কিন্তু তুমি কোথাও ছিলে না।
টেবিলে তোমার কাজ ছিল—
সেখানেও না।

দৈনিক কবিতা, বৈশাখ ১৩৭৫

ব্রিজ

গড়িয়াহাটের ব্রিজে গেলে
সামনেই সাজানো শহর,
পেছনে টুকরো স্মৃতি থাকে :
নিরিবিলি ঝিলে নীল-নীল হায়াসিন্থ।
ঢেউ বেয়ে ওঠা-নামা শুধু
গড়িয়াহাটের ব্রিজে গেলে॥

পূর্বাশা বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৭৫

স্বপ্ন

মা-র কান্না শুনলুম :
আর চারদিক অরণ্য হয়ে গেল!
সেই ভয়ংকর ছায়ায় মা-র কান্না!
কেন যে আমি এখানে, জানিনে।
শুধু মা-র কান্না!
কী করে পৌঁছুব সে কান্নার কাছে?
তারপরই ধাপ-ধাপ পাথর, পৌঁছুবার সঙ্কেত।
আর আমি ভূমিষ্ঠ হলুম।

অলিন্দ ৭ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫

আলো-অন্ধকারের কবিতা

সাহস হল না।
বস্তুত সাহসী নই রৌদ্রের মতন
খুব অন্ধকারে চলে যেতে।
যত কাছে এলে তুমি তত যেন বেশি অন্ধকার।
স্বচ্ছ করে দিয়ে যাব তোমাকে, তেমন
সাহস হল না।
ভীরু দীপ নিবে যাবে, ভয়ে—
চোখ অন্ধ হয়ে যাবে, ভয়ে—
একটি মুহূর্ত স্থির হয়ে যাবে, ভয়ে—
তোমাকে ছুঁতেই আর সাহস হল না।

সারস্বত, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫

জন্মাষ্টমী

জলে হাত রেখে বোঝা যায়
এই জলে ছিলেন ঈশ্বর।
জল নড়ে উঠে জলে
তারপর হাতের ভেতর।
হাত বেয়ে সমস্ত শরীরে।
মনে হয় কবে যেন বৃষ্টি হয়েছিল।
জলে হাত রেখে বোঝা যায়॥

অলিন্দ ৮ম সংখ্যা, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৭৫

বেহুলা

নাচো নাচো বেহুলা আমার,
বর্ষণ-ভোলানো নাচ নাচো,
নদী উৎসে এসে গেছে,
আমি এক মৃত প্রাণ ফুল্ল নগরের
সুরভিমদির নাগিনীরা
বর্ষণ উৎসবে নাচে, শরবিদ্ধ প্রাণ

তোমার ভেলায় যদি নিলে
নাচো জল, নাচো রক্ত, বেহুলা আমার॥

অলিন্দ অষ্টম সংখ্যা, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৭৫

স্বপক্ষে

কিছুই এখন আর বুঝতে পারিনে।
এত দেয়া-নেয়া শেষে কী যে বাকি থাকে
বুঝতে পারিনে।
এত চোখ কেন চেয়ে আছে,
এখনো তাকিয়ে থাকে কেন এত চোখ
কী চায়, কী নিতে চায় ওরা,
কী দিয়ে কী পেতে চায়, বুঝতে পারিনে।
দরজা-জানালা হাট করে
আমিও বা কেন বসে আছি,
বুঝতে পারিনে॥

পূর্বাশা, কার্তিক ১৩৭৫

মেয়েটির ছাদে

ঘুঘুর দুপুরে-নেয়া ডাক
কাছাকাছি, মেয়েটির ছাদে,
যেখানে সে কার্ডিগান বোনে,
শীতের সকালে,
দুপুরে উষ্ণতাকে বোনে॥

পূর্বাশা, অগ্রহায়ণ ১৩৭৫

আষাঢ় : চার

১

বৃষ্টিভেজা ভোরের মতন
নম্রতায় কী ম্লানই না তুমি!

কে ভিজিয়ে দিলে, বল, কার সে মৌশুমি—
আরণ্য সে মন
আমন্ত্রণ করেছিল কবে কোন্ মেঘ?

অনেক বসন্ত গ্রীষ্ম দিয়েছে উদ্বেগ
ভাবিনি বর্ষার কথা—ভাবতে দাওনি।
দু-বাহু চেনালে জানা যায়
অন্য পথ আছে কোনাকোনি
সে পথেই তুমি আজ ভিজে আছ বলে
আবার এসেছি ফিরে আষাঢ়ের জলে
কে মেঘ, অরণ্য কে যে—কে কাকে যে পায়!

২

কী যে আলোকিত মুখ দেখেছি রাত্রির অন্ধকারে
যে আলোকে পাখা পুড়ে যায়
যে আলোতে মন থেকে নিয়েছে বিদায়
সমস্ত কামনা, ফিরে সেই মনই পারে
যেন সে আলোতে হতে আলো!

আমাকে ভরালো
তোমার সে মুখ বুঝি অন্য প্রার্থনায় :
প্রেম-যাচ্ঞা নয় আর, প্রাণ যেন কণায়-কণায়
বিচ্ছুরিত সূর্যের মতন,
শুধুই দেবার আয়োজনে আবর্তন।

৩

তোমাকে ফাল্গুনে রেখে এসে
কী সুখে আষাঢ় নিয়ে থাকব বা আমি?
কোথায় বা তেমন আগামী—
যেখানে ফাল্গুন এসে মেশে!

তার আগে শীত।
আমি তো স্মরণ করি কেবলি অহিত :
কুয়াশায় মিলাবে যে সব জলভার!
তোমার ফুলন্ত মুখে ঠাঁই আছে শিশির-শোভার?

৪

নিঃসঙ্গতা ভেঙে দাও যখন তোমার সঙ্গ দিয়ে
পাই আমি রম্য অনুভব
শব্দে চূর্ণ হয়ে যায় অখণ্ড নীরব
হাজার কথায় মন দেয় বুঝি নিজেকে বিকিয়ে!

দুপুরকে করে দাও ভোরের কাকলি
নির্জনতা ঝরে যায় যত কথা বলি
হাজার স্বপ্নের শিশু চোখে করে খেলা।
তবু তুমি পরকীয়া, প্রেমে দিলে এত অবহেলা!

কবিতীর্থ, আশ্বিন ১৪০৭

রাত্রিপ্রতিম

হয়তো কখনো রাত্রি আপনার নির্জনতা নিয়ে অসহায়,
অসহায় কোনো এক পাখির মতন
যে-পাখির পাখা থেকে শুনেছি একাকী কোনো মন
সমস্ত আকাশ, রাত্রি, অন্ধকার ভেঙে দিতে চায়।
অসহায় সেই রাত্রি আপনারে ভেঙে দিতে পারে
মহৎ ঢেউয়ের মতো
প্রত্যুষের আলোর ফেনায়।
শুধু সে অসহায় পাখি যেন রাত্রির আকাশে থেকে যায়
থেকে যায় মনের কিনারে।
মনে হয়
কোনো পাখি, কোনো মেয়ে, কোনো এক উজ্জ্বল সময়
অন্ধকার পার হতে গিয়ে
অনেক আকাশ, রাত্রি, অন্ধকার নিয়ে
আমার একাকী মনে ডানা ঝাপটায়॥

বিষয়মুখ, জুলাই-ডিসেম্বর ২০০০

গান্ধীজি

তোমার স্বপ্নের আলো কত দূর নক্ষত্রের ঘ্রাণ
কত নীল তোমার আকাশ!
তোমার একটি প্রাণ
পার হয়ে-হয়ে এল কত ইতিহাস—
ভেঙে দিল ভূগোলের সীমা!
কী এক সমুদ্র-মন,
পাহাড়ের কী এক পিপাসা
আভা হয়ে, আশা হয়ে
অগণন রাত্রিতে জাগর!

মানুষের পরিচয়ে
হে এশিয়া, তোমায় পেলাম—
তেমনি পেলাম আজ বহুদিন পর ॥

বিষয়মুখ, জুলাই-ডিসেম্বর ২০০০

আয়না

তোমার চোখের আলো কি জানে সে-চোখের আলো
যে-চোখ তোমায় ছুঁয়ে-ছুঁয়ে গেছে অনেকদিন
অনেকদিনের ভোর হয়ে আর দুপুর হয়ে
গাঢ় দুপুরের হীরের গুঁড়ো কি পড়বে মনে?
কোনোদিন মনে পড়বে কি আর মনের আলো
রাত্রির মতো যা শুধু নিবিড়, অতলতল
সেই অতলের তুমি কী যে ছিলে জানবে, না তো
জানবে না আর তুমি যে ছিলে না তোমার মতো!
আমার আলোতে তুমি ছিলে এক প্রথম প্রাণ
জানে না যে এই আকাশ, সময়, আলোর কথা
জানে শুধু এক নিজের নরম অন্ধকার
খোঁজে আরো এক অন্ধকারের অন্ধ মন।
হয়তো তোমার আলো নেই তুমি এম্‌নি ছিলে
এম্‌নি চোখের, মনের, প্রাণের একটি মেয়ে,
তবু মনে হয় একটি মেয়েই অনেক আলো
একটি মেয়েই অনেক গভীর অন্ধকার ॥

বিষয়মুখ, জুলাই-ডিসেম্বর ২০০০

সবুজে মেয়ে

সবুজ মেয়েরা আসে বারেবারে এখনো আষাঢ়ে
সবুজ মেয়েরা দলে দলে।
সবুজ ফলের রঙ গালে
কচি চুল সবুজের ছায়া
সবুজ মেয়েরা আসে—
আলিসায়, জানালায়, আরো যে কোথায়!
কোথায়-কোথায় আসে!
জুঁইফুলে?
কাচা রোদে? মাঠভরা ঘাসে?
একটি সবুজ মেয়ে ভেঙে গেছে কাচের মতন
জানিনে কখন।
সবুজ আলোর কাচ মিশে গেছে আষাঢ়ের রোদে।
তারপর সেই আলো এখন অনেক—
অনেক সবুজ মুখ জানালায়, আলিসায়, মাঠে
আকাশে তাকায় একা, একা-একা হাঁটে ॥

বিষয়মুখ, জুলাই-ডিসেম্বর ২০০০

দূরে থাকা ভালো

দূরে থাকা ভালো
অনেকের সঙ্গে এক হয়ে।
কাছে এলে একা হয়ে যাবে
বড় একা, পাশে কেউ নেই,
কেউ নেই, তুমি ছাড়া যারা
তোমার মতন হতে পারে॥

বিষয়মুখ, জুলাই-ডিসেম্বর ২০০০

গাছে ফুল ছিল

গাছে ফুল ছিল,
এবং আকাশে রোদ, উড্ডীন কপোত।

কিন্তু তুমি কোথাও ছিলে না।
টেবিলে তোমার কাজ ছিল—
সেখানেও না॥

বিষয়মুখ, জুলাই-ডিসেম্বর ২০০০

খুব বৃষ্টি এল

খুব বৃষ্টি এল।
যুবতীর চোখে জল কত দিন দেখিনি যে তা-ই
মনে এল, মনে
কেঁদে গেল অনেক যুবতী।
হাতে জল মুছাবার সুখ
শুকনো হাতেই ফিরে এল॥

বিষয়মুখ, জুলাই-ডিসেম্বর ২০০০

বিকেলের রোদ

বিকেলের রোদ।
ভালোবাসা চোখে এক সলজ্জ কিশোরী।
ভালোবাসা চোখে এক সলজ্জ কিশোরী
কোনো বিকেলের রোদে ছিল।
বিকেলের রোদ :
ভালোবাসা, সলজ্জ কিশোরী।

বিষয়মুখ, জুলাই-ডিসেম্বর ২০০০

কুয়াশার পর্দা টেনে দাও :

কুয়াশার পর্দা টেনে দাও :
তোমার ঘনিষ্ঠ বাড়িঘর, মুখগুলো
সবই নূতন।

পরিচয়, অতীত ভুলিয়ে
তোমাকে শিশুর মতো করে দিতে পারে,
কুশায়ার পর্দা টেনে দাও॥

বিষয়মুখ, জুলাই-ডিসেম্বর ২০০০

অনেক কামিনী ফুটে আছে

অনেক কামিনী ফুটে আছে,
অনেক ঝরছে।
ছিঁড়তে, কুড়োতে, গন্ধ নিতে
ভয় হয়, পাছে
অনেক সময় চলে যায়।
ওদের সময় কম, তাই আরো ভয়॥

বিষয়মুখ, জুলাই-ডিসেম্বর ২০০০

হঠাৎ কোকিল শব্দ করে ওঠে

হঠাৎ কোকিল শব্দ করে ওঠে,
হঠাৎ ফুলের দিকে তাকাতে এমন ইচ্ছে করে,
উষ্ণ বঙ্গোপসাগরের হাওয়া
বাইরে দাঁড়ালে।
দেখলে অবাক হতে হয়
ক্যালেন্ডারে পয়লা ফাল্গুন॥

বিষয়মুখ, জুলাই-ডিসেম্বর ২০০০

সব-কিছু আছে

সব-কিছু আছে
কিন্তু কেন, তা-ই জানা নেই।
কেন ভালোবাসা, কেন ঘৃণা?
নিরুত্তর থাকছে হৃদয়।

জন্ম-মৃত্যু কেন?
নিরুত্তর থাকছে জীবন ॥

বিষয়মুখ, জুলাই-ডিসেম্বর ২০০০

আলো নিবলেই ভয় করে

আলো নিবলেই ভয় করে।
অন্ধকার মস্ত এক ছায়ার মতন
পেছনে দাঁড়িয়ে কাঁধে হাত রাখে, বলে :
"আলো তো নিবল!"
আলো তো নিবল, তারপর?
তারপর আমি যেন তার ॥

বিষয়মুখ, জুলাই-ডিসেম্বর ২০০০

মেঘের আকাশে স্তব্ধ তুমি

মেঘের আকাশে স্তব্ধ তুমি,
রৌদ্রে স্বচ্ছ হও,
কুয়াশায় কোথায় উধাও,
তোমাকে নাগাল পাওয়া ভার!
অথচ আমার রক্তে কী সহজে উচ্চারিত তুমি
এবং তোমার রক্তে আমি।

বিষয়মুখ, জুলাই-ডিসেম্বর ২০০০

আকাশে অনেক মেঘ কিন্তু বৃষ্টি নেই

আকাশে অনেক মেঘ কিন্তু বৃষ্টি নেই।
এক ফাঁকে ফিকে রামধনু আঁকে রোদ।
সব কাজ থমকে দাঁড়ায়,
একটি উৎসুক মেয়ে দেখলে যা হয় ॥

বিষয়মুখ, জুলাই-ডিসেম্বর ২০০০

সময়ের বাইরেই চলে যেতে হয়

সময়ের বাইরেই চলে যেতে হয়
যখন রাস্তায়, এস্‌প্লানেডে
ঘৃণা, উত্তেজনা।
সময়ের বাইরেই ভালোবাসা আছে।
আমাদের এই দুর্গে আছে,
যেখানে সময় আসবে না।

বিষয়মুখ, জুলাই-ডিসেম্বর ২০০০

এস শুভ উষা

(ঋক্‌বেদ। প্রথম মণ্ডল। সূক্ত ৪৯)

এস শুভ উষা স্বর্গচিত্র
এদিকে এভির শিরে হও রুচি অগ্রসর
উচলের থেকে নিচলে বহুক
উপত্যকার সীমায়, গুহক
গুহাবাসীদের গৃহ-অঙ্গনে অরুণোৎসব নিত্য
নৃত্য করুক অরুণ-নদীর সুন্দর অঙ্গর॥

পূর্বাশা, মাঘ ১৩৫৯

অশ্বিনা

(ঋক্‌বেদ। প্রথম মণ্ডল। ষোড়শাধিকশত সূক্ত। একাদশ পদ)

বন্দন-ঋষি নাসত্য-গীতি গায়
রাধ্য জনক, করেছ জ্যোতির্ময়,
নেতৃ তোমরা, তরুণ তরুর কায়,
দাও আরোগ্য দাও আত্মীয় জয়।
প্রতিশ্রুতিতে বদ্ধনারীশ্বর
বরণ করছে স্বস্তি-বচনে মন,
নির্জন দেশে যে ধনরাশির বর
রেখেছ তারি এ দান, করি আয়োজন।

পূর্বাশা, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৬১

অত্রি ঋষি বলছেন

(ঋক্‌বেদ। পঞ্চম মণ্ডল। সূক্ত ৮৫)

শোনো শোনো বিস্ময়
অসুর-শূরের দেবতা বিশ্বময়
মাতৃঋশ্বা বরুণের গাহি জয়।
দণ্ড ও মানদণ্ডের নাহি ক্ষয়।
মার্তণ্ডের মুণ্ড মাতা· সে মেয় পৃথ্বীর অমেয় পাদনিচয় ॥৫॥

অপরাজেয় যে মহৎ অসুর এও তারি যেন মায়া
সব নদী সব নদ গদগদ ধ্বনি নিয়ে বহু কায়া—
বহুকায়া তবু একই সমুদ্রে মুদ্র—
একই সমুদ্র তবু অপূর্ণ তারা বহু, তারা ক্ষুদ্র ॥৬॥

পূর্বাশা, আষাঢ় ১৩৫৯

এস উষা

(ঋক্‌বেদ। সপ্তম মণ্ডল। সূক্ত ৭১)

নক্ত-জয়নী আকাশের জল এস উষা তুমি রঞ্জিত করে কৃষ্ণা
অরুষ-অরুণে ছড়ায়ে পন্থা দাও সান্ত্বনা সন্তানে সৎ তৃষ্ণা
অশ্ববাহিনী গুহাবাসী কর নাশ
গোপন অন্ধকারের দুর্বিলাস
অঙ্গে পরুক তোমার দানের রাশ
দূর হোক দিবা-রাত্রির মহাসঙ্গমে সব শ্যেন-শকুনিব হিংসা
রোমশ-গাত্রা শর্বরী সরে থাক নিয়ে তার রঙের চিহ্ন ভিন্‌ সাম ॥

পূর্বাশা, ফাল্গুন ১৩৫৯

সরস্বতী

(ঋক্‌বেদ। সপ্তম মণ্ডল। বাসিষ্ঠ ত্রৈষ্টুভ ছন্দ। যাঁরা সারস্বত ছিলেন এ ষড়ঋচ বা ছয়টি ঋক্ তাঁদের নির্মাণ। তাঁরা প্রয়াগের প্রথম আর্য)

প্রথম ঋক্। পাবীরবী কন্যা চিত্রায়ু এখানে সরস্বতী।
ধাত্রী যাত্রী উদক-বহনে ত্বরান্বিতা
স্যন্দনশীলা সরস্বতীর গাইব গীতা।
তুমি মনোরথী ব্যবধান-রচা অঙ্গে অতি,
আয়সী অরুণা আমাদের তুমি সরস্বতী॥

দ্বিতীয় ঋক্। পাশুপত আদিত্য চেদীর অতীতা নদী।
একা তুমি যেন অচেতনা নদীগিরির দেশে
শুচি গতি-শীলা অবশেষে গিয়ে সাগরে মেশে।
এনে দাও রায় প্রভূত বিভব ভুবন ভরে
পিপাসী নাহুষ মোদের ঘৃতের দুধের ঘরে॥

তৃতীয় ঋক্। মধ্যভারতের ব্রতী পাশুপতদের নদী।
যজ্ঞের হেতু শিশু-বৃষ কর ধারণ তুমি,
মঘবান্ ঋষি তাই তো পেয়েছে যজ্ঞভূমি।
সরস্বতের দেবতা এ পশু, সেবাই সৎ
ধর্ম তাঁদের, সবার তনুরে করা শ্রীমৎ॥

চতুর্থ ঋক্। নৈষিবস্যের প্রাক্তনা নদী।
উদিত জুষার প্রীয়মাণা এই উৎসা নদী
শ্রবণসুভগা যজ্ঞ-বাহিনী জন্মাবধি।
নমস্য মিতক্ষুভার ঐরিয়ানার রায়া,
নমো নমো উত্তরা-সখী যাঁরা ঘোষিত-কায়া॥

পঞ্চম ঋক্। গোপী দধিকাণ্বদের নদী
নমো যোগে তুমি প্রতি স্তোমে হও যুক্তমতী,
হবি-আহ্বানে তোমাকেই ডাকি সরস্বতী।
গোপী-প্রিয়তমে তোমার শর্মা তোমার কোলে
আশ্রয় নেবে যাবে না কখনো বৃক্ষতলে॥

ষষ্ঠ ঋক্। বশিষ্ঠের নদী সরস্বতী।
বশিষ্ঠ আছে, আছে আজো সেই বায়ুর দেশ
দ্বারাবতী আর দ্বারাবৃতেদের সুভগ শেষ।

বর্ধন করো, শুভ্রে, গীতির রাসের ভাষে
অন্ন-অগ্নি-স্বস্তিকা যেন সদাই আসে ॥

(অনুবাদকের মন্তব্য : সাত মাত্রার ত্রিষ্টুভ ছন্দ অনুসৃত হয় নি অনুবাদে। ত্রিষ্টুভ 'দীর্ঘ-হ্রস্ব-দীর্ঘ-দীর্ঘ' প্রস্বন-যুক্ত লয়ের ছন্দ। এ লয়ে অনূদিত পংক্তিগুলো পড়া যাবে।)

পূর্বাশা, অগ্রহায়ণ ১৩৬০

ঈরাণী 'গাথাঃ অহুনবৈতি'

১

'মজদ' রজের চলৎ-শক্তি, প্রার্থী ঊর্ধ্ব হস্তে
কোন্ অর্ঘ্যের গাথার দর্পে বলি তাদের নমস্তে
সংস্কৃতী যারা 'অষে'র অনুগ্রহের দান
'বোহুমনো' দ্বারা মাহাত্ম্যে যারা অশেষ পুণ্যবান
'গেয়ুস উর্ব গোমাতার সন্তান?

২

'উন্মাজ্‌দহ' আমি বহুমন, অজ, উর্মিজ তোমা উর্মিদহন করি যে বহন।
তুমি দাও, 'দিক 'অশ' এ-আশীষ বিশ্বরূপের, অপ্সরলোক মহন্।
অশের এ-দান অশেষ উৎস সদভিলাষীরা ভালোবেসে করে চয়ন॥

৩

আমি তো তোমার, হে 'অশ', তোমায়—'বোহুমনো'রেও শংসি।
অভাজ-শক্তি 'উর্মাজদহ' দক্ষতা এক-অংশী।
আর প্রজ্ঞান! প্রাচুর্যদান। প্রার্থনা কয় পূর্ণ আমার, প্রিয়তম, তম-ধ্বংসী॥

পূর্বাসা, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৫৯

'আবেস্তা'র যশ্ন

ক্ষমা করো মাটি উর্বী ও গাভীগ্রস্তা।
গ্রীষ্মে কোরো না সরোজদামিনী ত্রস্তা॥

পূর্বাশা, ফাল্গুন ১৩৬১

তামিল ‘কুরল’

যদি না বাদল নামতো আকাশ চেয়ে
ক্ষুধিত দেবতা ফিরতো প্রসাদ চেয়ে। ১।

বেণুবীণা-রব ভালো কে গো মনে গোনো
শিশুর কাকলি বুঝি শোনোনি কখনো! ২।

নিলাজ হৃদয়ের কেমন কাজ
সুতোয় বাঁধা যেন পুতুল-নাচ। ৩।

চোখে-চোখ-রাখা কথা থাকলে
কী হবে না-ই বা যদি ডাকলে! ৪।

চাষী তার মৃত্তিকাতে যদি না তাকায়
প্রোষিতভর্তৃকা হয়ে মাটি গায়ে মাটিই মাখায়। ৫।

পূর্বাশা, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩৬১

সাফো : অনক্তরির প্রতি

হয়তো পদাতিক, অশ্বসাদী সব, নৌবহর বা কী সুন্দর—
ভাবছে কেউ কেউ, এ ধারা গম্ভীরা. আমি তো ভাবি প্রিয় রূপবান।
সবাকে বোঝাতে তা সহজ ঢের ঢের, রূপসী হেলেনও তো ভেবেছে তাই
যার না রূপে মেতে প্রেমিক রূপবান ধ্বংস করে দেয় তীর্থ ট্রয়!
সে নারী ভাবেনি তো শিশুর কথা তার, ভাবে নি পিতামাতা, মোহের ঘোর
এমনি সাইপ্রিস দিয়েছে তার চোখে, এমনি হয়েছে সে প্রেম-কাতর।
তরুণী মন তাই, দুলছে ফুলে-ফুলে ভ্রমর-ইচ্ছায় অনুরাগ।
অনক্তরি, আয়, মনের উপরেই, যখন পাশাপাশি নেই তুই!
দেখতে পাই যেন কম্র পদপাতে, শরীরে জ্যোৎস্না-উচ্ছলতা,
চাইনে পদাতিক, চাইনে রথারোহী, লিডিয়া রণে যাক, ভুলব সব।

অন্যরূপ-রূপান্তর, বম সঙ্কলন, শ্রাবণ ১৩৭৩

জীবনীপঞ্জি

জন্ম : পূর্বতন ত্রিপুরা জেলার পশ্চিমপ্রান্তে মেঘনা তীরবর্তী শ্যাম গ্রামে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ৩ ফেব্রুয়ারি সঞ্জয় ভট্টাচার্যের জন্ম। পিতা : রাজকুমার ভট্টাচার্য; মাতা : শশীমুখী দেবী।

শৈশব : ছোটবেলায় অত্যন্ত লাজুক ও অন্তর্মুখ ছিলেন। ভালোবাসতেন যাত্রাগান, কবিগান-ইত্যাদি। স্কুলের শেষে পাঁচ বছর 'আরতি' নামে একটি হাতে-লেখা পত্রিকা প্রকাশে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। শৈশবে 'কাজীর বিচার' নামে তাঁর একটি লেখা 'খোকাখুকু' পত্রিকায় প্রকাশিত ও পুরস্কৃত হয়। এইভাবে ক্রমশ গড়ে উঠতে থাকে তাঁর উত্তরকালের লেখকসত্তাটি।

শিক্ষা : পাঁচ বছর বয়সে ত্রিপুরার অন্তর্গত কুমিল্লা শহরে ঈশ্বর পাঠশালায় তাঁর শিক্ষারম্ভ। ১৯২৬ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে এন্ট্রান্স পাস; কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে আই.এস.সি পাস; পরে ওই কলেজ থেকেই ১৯৩০ সালে ডিসটিংশনসহ বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ১৯৪১ সালে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে 'প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি' বিষয়ে এম.এ.।

কর্ম : কখনও কোনও নির্দিষ্ট বেতনেব নিয়মিত কর্ম করেননি। আজীবন সাহিত্যব্রতী এই অকৃতদার মানুষটির প্রধানতম অবলম্বন ছিলেন তাঁর অভিন্নসত্ত অকৃতদার বন্ধু সত্যপ্রসন্ন দত্ত। সুদীর্ঘ আটত্রিশ বছর কুমিল্লা থেকে কলকাতা 'পূর্বাশা' পত্রিকা সম্পাদনা ও পূর্বাশা প্রেস, প্রাচী প্রেস, সবিতা প্রকাশ-ভবন-প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে উভয়ে সম্পৃক্ত ছিলেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে যুগ্মভাবে 'নিরুক্ত' কবিতা পত্রিকাও সম্পাদনা করেন (১৯৪০-১৯৪৩)। পূর্বাশা লিমিটেডের পুঁজি বাড়াবার লক্ষ্যে যশোরের বসতপুরে বারো-শ বিঘে জমি কিনে মডেল ফার্মিং অ্যান্ড মেশিনারির পত্তন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্যাঙ্ক-ব্যবসার বিপর্যয় এবং দেশভাগের ফলে এই উদ্যোগের ভরাডুবি ঘটে। তার প্রচণ্ড অভিঘাত এই দুটি মানুষকে বিপর্যস্ত করে।

কাব্যগ্রন্থ : সাগর ও অন্যান্য কবিতা (১৯৩৫); পৃথিবী (১৯৩৯); সংকলিতা (১৯৪২); নতুন দিন (১৯৪৭); প্রাচীন প্রাচী (১৯৪৮); যৌবনোত্তর (১৯৪৮); স্ব-নির্বাচিত কবিতা (১৯৫৮); সবিতা (১৯৫৮), উত্তরপঞ্চাশ (১৯৬৩); উর্বর উর্বশী (১৯৬৫); সঞ্জয় ভট্টাচার্যের শ্রেষ্ঠ কবিতা (প্রথম ভারবি সংস্করণ ১৯৭৬)।

প্রবন্ধ-গ্রন্থ : তিনজন আধুনিক কবি (১৯৪৪); বাংলা কবিতার ছন্দ (১৯৪৯); আধুনিক কবিতার ভূমিকা (১৯৫৯); কবি জীবনানন্দ দাস (ভারবি ১৯৭০)।

মৃত্যু : একান্ত ভালোবাসার জন এক নারীর (অথবা প্রেমিকার) অকালমৃত্যুর বিচ্ছেদবেদনা, পূর্বাশাকে ঘিরে তাঁর সংকল্প এবং স্বপ্নভঙ্গের বেদনা—এসব কিছুর জন্য জীবনের শেষ কুড়ি-পঁচিশ বছর মানসিক বিপর্যস্ত কবি ১৯৫১ সালে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। হাসপাতাল থেকে বেঁচে ফিরলেও বেশ-কিছুকাল মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন। ১৯৫৫ সালের অক্টোবরে কলকাতার লুম্বিনি পার্ক মানসিক হাসপাতালে কিছুকাল কাটিয়ে আবারও সাহিত্যকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ৩ বা ৪ ফেব্রুয়ারি তাঁর মৃত্যু হয়।